ইস্টিশন

হুমায়ুন আহমেদ

ভূমিকা

জোছনার ফুল নামে একটা টিভি নাটক বানাব, তার জন্যে সেট ফেলেছি গাজীপুরে। জঙ্গলের ভেতর রেল স্টেশনের সেট। চমৎকার সেট তৈরী হল। মেকি রেল লাইন, রেল লাইনে শোলার পাথর। হার্ডবোর্ডের মালগাড়ীর ওয়াগান। এক জোছনা রাতে আমি সেট দেখতে গেলাম জঙ্গলের ভেতর। কি সুন্দর নির্জন রেল স্টেশন! মোটেও মেকি মনে হচ্ছে না। আমি রেল লাইন ধরে অনেক্ষণ হাঁটলাম। তারপর স্টেশনের প্লাটফর্মে চুপচাপ বসে রইলাম। রেল স্টেশনে আমি একা। দ্বিতীয় কোন মানুষ নেই। একসময় আমার গা কেন জানি ছমছম করতে লাগল। তার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মাথার ভেতর নির্জন গ্রামের রেল স্টেশনের গল্প ঢুকে গেল। এই হল 'ইস্টিশন' লেখার ইতিহাস।

হুমায়ুন আহমেদ
নুহাশ পল্লী,
গাজীপুর।
২৮-০৮-৯৯

আমার বড় ভাই দ্বিতীয় বারের মতো স্কুল ফাইন্যাল ফেল করে খুবই রেগে গেল। সাধারণ রাগ না, ভয়ংকর রাগ। কাছে গেলে ফোঁসফোঁস শব্দ পর্যন্ত শোনা যায়। বাবা আমাকে ডেকে বললেন, কয়েক দিন ওকে ঘাঁটাবি না। দূরে-দূরে থাকবি। দ্বিতীয়বার ফেলটা সব সময় মারাত্মক। তিনবার ফেল করে ফেললে আবার সব স্বাভাবিক। ফেলটা তখন ডাল ভাতের মতো হয়ে যায়। যারা এমনিতেই রাগী স্বভাবের তিনবার ফেল করার পর তাদের মধ্যেও মোলায়েম ভাব চলে আসে। গলার স্বরও মেয়েলি হয়ে যায়। তিনবার ফেলের এটাই আসল মজা।

বাবা পাঞ্জাবির পকেট থেকে পঞ্চাশ টাকার একটা নোট বের করে বললেন, যা রঞ্জুর হাতে দিয়ে আয়। এই সময় হাতে টাকা পয়সা থাকলে মনটা শান্ত থাকে। মন শান্ত থাকা এখন বাঞ্ছনীয়। মন শান্ত না থাকলে উল্টাপাল্টা কিছু করে ফেলতে পারে।

আমি বাবার সঙ্গে ইস্টিশনঘর পর্যন্ত যাচ্ছি। ছুটির দিনে বাবাকে ইস্টিশনঘর পর্যন্ত এগিয়ে দেয়া আমার অনেক দিনের অভ্যাস। আগে তার আঙ্গুল ধরে ধরে যেতাম। এখন আঙ্গুল ধরতে লজ্জা লাগে। আঙ্গুল না ধরলেও তাঁর পাশাপাশি গা ঘেঁসা চাই। বাবার গা ঘেঁসে হাঁটলে তাঁর শরীরের ঘামের গন্ধ পাওয়া যায়। বাবার ঘামের এই গন্ধটা খুবই মজার। বাবা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বললেন, রঞ্জুর জন্যে বড়ই চিন্তাযুক্ত। উল্টাপাল্টা কিছু না করলেই হয়।

আমি বললাম, উল্টাপাল্টা কী করবে?

‘ধর ফাঁস নিয়ে ফেলল। তিন গজ নাইলনের দড়ি কিনে শিমুল গাছের ডালে ঝুলে পড়ল। তিন গজ এক নম্বুরি নাইলনের দড়ির দাম পনেরো টাকা। পনেরো টাকা যোগাড় করা কঠিন কিছু না। মেট্রিকের রেজাল্টের পর খুব কম হলেও দেড় দুইশ ছেলে ঝুলে পড়ে। গাছে ঝুলল, পুট করে জিব বের হয়ে পড়ল – সব শেষ।’

‘কী সর্বনাশ!’

‘সর্বনাশ বলে সর্বনাশ। গাছে—মাছে সর্বনাশ। স্কুলে আমার এক ক্লোজ ফ্রেন্ড ছিল বিধু। ভালো নাম বিধায়ক আমরা ডাকতাম বিন্দু বিধু। বিন্দুর মতো ছোট খাট বলেই বিন্দু বিধু। ইংরেজীতে BB, হিন্দু তো এই জন্যে পড়াশোনায় মারাত্মক টাইপ। হিন্দুরা পেয়াজ খায় না বলে পড়াশোনায় ভাল হয়। স্কুলে বরাবর ফার্স্ট হত। এই বিধু মেট্রিকে ফেল হয়ে গেল।’

‘তুমি পাশ করলে?’

‘প্রথম চান্সে পারি নি। আমাদের সময় প্রথম চান্সে কেউই পারত না। বিন্দু বিধু যে বার ফেল করল সেবার আমিও ফেল। সেকেন্ড চান্সে কেটে বের হয়ে গেলাম। আমার কথা বাদ দে বিধুর কথা শোন। ও যখন দেখল পত্রিকায় রোল নাম্বার নেই – তখন গরুর গলার দড়ি খুলে নিয়ে কাঁঠাল গাছে ঝুলে পড়ল। তখন নাইলনের দড়ি ছিল না। গরুর গলার গোবর মাখা দড়িই ভরসা। বিশ্রী অবস্থা। জিব বের হয়ে আছে। ধুতি লুঙ্গির মতো প্যাঁচ দিয়ে পরেছিল সেই ধুতি খুলে পড়ে গেছে। ‘ইয়ে’টা দেখা যাচ্ছে। ফাঁস নিয়ে মরা মানুষের ‘ইয়ে’ আবার খুবই লম্বা হয়ে যায়। একটা নেংটা মানুষ দড়িতে ঝুলছে। কেউ যে গিয়ে ধুতি পরিয়ে দেবে সেই উপায় নেই। পুলিশ আসার আগে কিছুই করা যাবে না। যে এই কাজ করবে পুলিশ তাকে ধরে নিয়ে যাবে। হাজতে ঢুকিয়ে রুলের ডলা দেবে। ফাঁসির মরা কখনো দেখেছিস?’

‘না।’

‘খবর্দার দেখবি না। রাতের ঘুম হারাম হয়ে যাবে। এক সপ্তাহ ভাত খেতে পারবি না।’

বাবা পাঞ্জাবির পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করলেন। সিগারেট খাবার সময় বাবা কোনো কথা বলেন না। খুবই উদাস হয়ে থাকেন। তখন তাঁকে দেখে মনে হয় তিনি খুবই দুঃখী একজন মানুষ। বাস্তবে তিনি মোটেই দুঃখী মানুষ না, হাসি খুশি মানুষ। তাঁকে আমি কখনো রাগতে দেখি নি, উঁচু গলায় কথা বলতে শুনি নি। মা যখন বাবার সঙ্গে রাগারাগি করেন, বাবা খুব আগ্রহ নিয়ে মা’র কথা শুনেন। তখন তাঁকে দেখে মনে হয় মা’র প্রতিটি কথায় তিনি মজা পাচ্ছেন। মা’র রাগ যখন শেষ সীমায় চলে যায় তখন বাবা বলেন, সুরমা তোমার প্রতিটি কথাই ‘কারেক্ট’। আমি তোমার সঙ্গে ‘এগ্রি’ করছি। সেন্ট পারসেন্ট এগ্রি। এখন তুমি আমাকে যা করতে বলবে, আমি করব। পায়ে

ধরতে বললে ধরব। নো প্রবলেম। স্ত্রী যদি স্বামীর পায়ে ধরতে পারে। স্বামীও পারে। এতে কোনো পাপ হয় না। স্বামী স্ত্রীর একে অন্যের পায়ে ধরা জায়েজ আছে।

বাবার এ ধরণের কথায় হঠাৎ মা'র মধ্যে একটা বিস্ফোরণের মতো হয়। তিনি হাতের কাছে যা পান ছুঁড়ে মারতে শুরু করেন। বাবাকে তখন খুবই অসহায় লাগে। যত অসহায়ই লাগুক এই সময় বাবার আশেপাশে থাকা খুবই বিপজ্জনক বলে আমি কখনো থাকি না। থাকি না বলেই জানি না, ঝড়টা কী ভাবে কাটে। কী ভাবে বাবা মা'র মধ্যে মিলমিশ হয়। শুধু এক সময় দেখা যায় বাবা ভেতরের বারান্দায় বেতের মোড়ায় বসে পান খাচ্ছেন। মা আঙুলের ডগায় করে বাবার জন্যে চুন নিয়ে এসেছেন। বাবা মা'র আঙুল থেকে নিজের আঙুলে চুন নিয়ে আয়েশ করে জিবের ডগায় লাগাচ্ছেন। আঙুল থেকে আঙুলে চুন নেয়া খুবই অলক্ষুণে। এতে সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যায়। শুধু স্বামী স্ত্রীর বেলায় সুলক্ষণ। স্বামী—স্ত্রীর বেলাতেই শুধু আঙুল থকে আঙুলে চুন নিলে সুসম্পর্ক হয়।

বাবা বারান্দায় মোড়ায় বসে পান খাচ্ছেন আর মা আঙুলে চুন নিয়ে পাশে দাঁড়িয়ে আছেন, দেখতে বড় ভালো লাগে।

আচ্ছা এখন আমাদের পরিচয়টা দিয়ে নিই। আমার বাবার নাম আজহার উদ্দিন। তিনি নান্দাইল রোড স্টেশনের স্টেশন মাস্টার। বয়স পঞ্চাশের ওপর। গায়ের রঙ কুচকুচে কালো বলে, দাঁতগুলি ধবধবে শাদা দেখায়। মনে হয় দাঁতে লাইট ফিট করা। অন্ধকারে জ্বলে। বাবা যেমন রোগা তেমন লম্বা। বাবার বন্ধুরা তাঁকে আজহার উদ্দিন ডাকে না, ডাকে তালগাছ উদ্দিন। এতে বাবা খুবই মজা পান। কেউ তাঁকে তালগাছ উদ্দিন ডাকলে সঙ্গে সঙ্গে তিনি পায়ের বুড়ো আঙুলে ভর করে আরেকটু লম্বা হন। জোকারি করতে বাবার খুব ভালো লাগে।

আমার মা'র নাম সুরমা। সিলেটের এক নদীর নামে তাঁর নাম। বাবা মাঝে মাঝে আদর করে তাঁকে কুশিয়ারা ডাকেন। কুশিয়ারাও সিলেটের আরেক নদী। কুশিয়ারা নদীটা ছোট হলেও সুরমা'র চেয়েও নাকি সুন্দর, টলটলা পানি। নদীর তলার বালি পাথর সব দেখা যায়। মা বয়সে বাবার চেয়ে অনেক ছোট। তাঁর বয়স খুব সম্ভব পঁয়ত্রিশের মতো। সব সময় তিনি কোনো-না-কোনো অসুখে ভুগেন। যখন তাঁর কোনো অসুখবিসুখ থাকে না তখন তাঁর আধাকপালী মাথা ব্যথা হয়। এই সময় ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করে দিয়ে তাঁকে শুয়ে

থাকা লাগে। কোনো রকম শব্দ করাও তখন নিষিদ্ধ। কেউ তখন শব্দ করে নিঃশ্বাসও ফেলতে পারবে না, এমন অবস্থা।

মা'র আধকপালী অসুখে বোধ হয় কোনো সমস্যা আছে। কারণ এই অসুখটা যখন হয় তাঁর চেহারা তখন অন্য রকম হয়ে যায়। কী রকম অদ্ভুত করে তিনি সবার দিকে তাকান। মাঝে মাঝে এমনও হয় তিনি কাউকে চিনতে পারেন না। একদিন মা'র এ রকম মাথাব্যথা শুরু হয়েছে। আমি না জেনে তাঁর ঘরে ঢুকে পড়েছি। অবাক হয়ে দেখি গরমের মধ্যে তিনি কাঁথা গায়ে দিয়ে বসে আছেন। বড় বড় করে নিঃশ্বাস নিচ্ছেন। আমার দিকে তাকিয়ে বললেন – এই ছেলে এই, তোমার নাম কী? এইখানে কী চাও? যাও বাসায় যাও। দুপুর বেলা কেউ অন্যের বাড়িতে বসে থাকে, তোমার লজ্জা নাই?

আমি মা'র কথা শুনে অবাক হয়ে বললাম, মা আমাকে চিনতে পারছ না। আমি টগর।

মা আমার দিকে তাকালেন। তাঁর তাকানো দেখেই বুঝলাম তিনি আমাকে মোটেও চিনতে পারেন নি। মা বললেন, টগর তোর নাম? আমার সঙ্গে ফাজলামি? আমি তোর মুরুব্বি না? এই বলেই তিনি চক্ষের নিমিষে বালিশের নিচে রাখা সুপারি কাটার ছরতা আমার দিকে ছুঁড়ে দিলেন। ছরতা লেগে আমার মাথা কেটে গেল। এরপর আর কখনো আধকপালী মাথা ব্যথা উঠার সময় আমি মা'র ঘরে ঢুকি না।

আমার স্কুলের বন্ধুদের অনেকের ধারণা মা'র মাথা খারাপ। তাঁকে ঘরে তালাবন্ধ করে রাখা হয়। এটা ঠিক না। মাকে কখনো তালাবন্ধ করে রাখা হয় না। মা'র যখন মাথা ব্যথা থাকে না তখন তিনি সবার সাথে মজা করেন। সবচে বেশি মজা করেন রঞ্জু ভাইয়ার সঙ্গে। মা রঞ্জু ভাইয়াকে যতটা পছন্দ করেন রঞ্জু ভাইয়া মা'কে তারচে তিনগুন বেশি পছন্দ করে। মা'র মাথা ব্যথা অসুখ হলে – রঞ্জু ভাইয়া স্কুলে যাবে না। মা'র ঘরের বন্ধ দরজার আশেপাশে ঘুর ঘুর করবে। ঘরের ভেতর থেকে খুট করে কোনো শব্দ হলেই রঞ্জু ভাইয়া বলবে – মা তোমার কিছু লাগবে? বাইরে থেকে কথা বললেও রঞ্জু ভাইয়াও অসুখের সময় মা'র ঘরে ঢুকবে না। আমার মতো সেও মা'র ঘরে ঢুকতে ভয় পায়।

মা'র অসুখবিসুখ এবং আধকপালী রোগে ঘরের কাজ কর্মের কোনো অসুবিধা হয় না। বাবার দূর সম্পর্কের এক বোন (রহিমা ফুপু) সব কাজ করেন। এই মহিলা আশ্চর্য ধরণের মহিলা। খুবই রূপবতী। তাঁকে দেখলে মনে হয় তিনি সব সময় সেজেগুজে আছেন। চুল সুন্দর করে আঁচড়ানো, শাড়িটা সুন্দর করে পরা। তাঁকে কখনো কাজ করতে দেখা যায় না, অথচ ঘরের প্রতিটি কাজ তিনি করেন। তাঁর একটা মাত্র মেয়ে কুসুম। মেয়েকে নিয়ে তিনি আমাদের সংসারে থাকেন কারণ তাঁর স্বামী তাঁকে ছেড়ে চলে গিয়েছেন। রহিমা খালার মেয়েটা তাঁর মা'র মতোই সুন্দর। তবে চেহারা কেমন যেন ভোঁতা ভোঁতা। তার পরেও কুসুম আপুকে দেখতে খুবই ভালো লাগে। আমার সব সময় ইচ্ছা করে তার আশেপাশে থাকতে। কুসুম আপু খুবই অহংকারী। সহজ ভাবে সে তাকাতেই পারে না। সব সময় বিরক্ত চোখে তাকায়। আমি কোনো কারণে তার কাছে গেলে সে ভুরু কুচকে বলবে, এই টগর! তুই সব সময় মেয়েদের আশেপাশে ঘুরঘুর করিস কেন? মেয়েদের গায়ের গন্ধ নাকে না গেলে ভাল লাগে না? এখনই এই অবস্থা? ফাজিল কোথাকার। গন্ধ নেবার সময় হোক, তখন গন্ধ নিবি। যা সামনে থেকে।

কুসুম আপু ক্লাস টেনে পড়ে। আগামী বছর সে এস. এস. সি. দেবে। তবে রঞ্জু ভাইয়ের মতো ফেল করবে না। এক চান্সেই পাশ করবে। কুসুম আপু ছাত্রী খুবই ভালো। ক্লাস ফাইভে বৃত্তি পেয়েছে। ক্লাস এইটেও বৃত্তি পেয়েছে।

আমরা থাকি রেল কোয়ার্টারে। ইস্টিশন ঘরের কাছেই লাল ইটের পাকা দালান। কোয়ার্টারটা দেওয়াল দিয়ে ঘেরা ছিল। জায়গায় জায়গায় সেই দেওয়াল ভেঙ্গে গেছে এবং সেই সব ভাঙ্গা জায়গায় আপনা আপনি লেবু গাছ গজিয়েছে। প্রকান্ড সব গাছ। খুব ফুল ফোটে, কখনো লেবু হয় না। গাছের মধ্যেও নারী পুরুষ আছে। আমাদের লেবু গাছ গুলোর মধ্যে একটা ছাড়া সবই নাকি পুরুষ। যে নারী গাছটা আছে সেটাতেও লেবু হচ্ছে না। বাবার ধারণা, পুরুষ গাছের সঙ্গে থেকে-থেকে মেয়ে গাছটার মধ্যেও পুরুষালী ভাব চলে আসছে। আমাদের রেল কোয়ার্টারে প্রতি বর্ষায় ঘরে সাপ ঢোকে। বাস্তু সাপ বলেই কখনো মারা হয় না। তবে বাবা চিন্তিত হয়ে কার্বলিক এসিড কিনে এনে ঘরে ছড়িয়ে দেন। বাবার আবার খুবই সাপের ভয়। রেল কোয়ার্টারে তিনটা মোটে ঘর। একটাতে থাকেন মা-বাবা। একটায় রহিমা ফুপু আর কুসুম আপু। আর একটা হল বৈঠক

খানা। সেখানে বড় চৌকি পাতা আছে। এই চৌকিতে থাকি আমরা দুই ভাই। রেল কোয়ার্টারের ভেতরের বারান্দার একটা অংশ বাঁশের দরমা দিয়ে ঢেকে ঘরের মতো করা হয়েছে। প্রায়ই বাবাকে সেখানে থাকতে হয়। কারণ মা'র আধাকপালী মাথাব্যথা উঠলে তিনি কাউকে সহ্য করতে পারেন না। তখন তিনি একা থাকেন। আমার ধারণা তখন বাবাও মা'কে আমাদের মতো ভয় পান।

বারান্দায় বাবার ঘরটা খারাপ না। খুব বাতাস আসে। শুধু বর্ষা বাদলার দিনে সমস্যা হয়, বৃষ্টির পানি ঢোকে। বাবা বালিশ হাতে খুবই লজ্জিত ভঙ্গিতে আমাদের ঘরে ঘুমুতে আসেন। ভাইয়ার মেজাজ যেদিন ভালো থাকে সেদিন বাবা আমাদের সঙ্গে ঘুমুতে পারেন। ভাইয়ার মেজাজ খারাপ থাকলে সে রাগী রাগী গলায় বলে, এতটুকু একটা খাটে তিনজন মানুষ ঘুমাব কীভাবে? আমরা কি বামুন?

বাবা মিনমিনে গলায় বলেন, আমি রোগা মানুষ এক হাত জায়গা হলেই হবে। দড়ির মতো পড়ে থাকব। তোরা বুঝতেও পারবি না।

'গরমের মধ্যে চাপাচাপি করে ঘুমাতে পারব না।'

'গরম কই দেখলি? ঝুম ঝুম বৃষ্টি হচ্ছে। কাথা-শীত পড়ে গেছে।'

'কাঁথা-শীত পড়লে তুমি কাঁথা গায়ে দিয়ে থাক। আমার গরম লাগছে।'

বাবা আর কথা বাড়ান না। ছাতা হাতে ইস্টিশনঘরে ঘুমাতে যান। ইস্টিশনঘরে সিন্দুকের মতো বড় একটা বাক্স আছে। সেই সিন্দুকের ওপর পাটি পাতা আছে। বাবাকে মাঝে মধ্যেই সেই সিন্দুকের বিছানায় ঘুমুতে যেতে হয়। ইস্টিশন ঘরটা খারাপ না, শুধু ঘর ভর্তি মাকড়শা। সব সময় দেখা যাবে তিন চারটা বড় বড় মাকড়শা পেটে ডিম নিয়ে ঘুরছে। বাবার ধারণা ইস্টিশন ঘরটা মাকড়শাদের মাতৃসদন। গর্ভবতী সব মাকড়শা ইস্টিশন ঘরে সন্তান খালাস করার জন্যে চলে আসে। আমি মাকড়শা ভয় পাই বলে কখনো বাবার সঙ্গে ইস্টিশন ঘরে ঘুমুতে যাই না।

সবার কথা বলতে গিয়ে আমি দেখি নিজের কথাই বলতে ভুলে গেছি। আমার নাম টগর। আমার জন্মের সময় বাবা ছিলেন বারহাট্টা স্টেশনের স্টেশন মাস্টার। আমাদের রেল কোয়ার্টারে দু'টা টগর গাছ ছিল। দু'টা গাছেই প্রচুর টগর ফুল ফুটতো। টগর ফুল দেখেই বোধ হয় বাবা আমার নাম রেখেছিলেন টগর। ফুলের নামে ছেলেদের নাম রাখলে তারা মেয়েলি স্বভাবের হয়। সামান্য

কিছুতেই পুত পুত করে কাঁদে। কথাটা খুব ঠিক, আমিও কাঁদি। এবার আমি ক্লাস সিক্সে উঠেছি। রেজাল্ট আউটের দিন আমাদের ক্লাস টিচার বদরুল স্যার আমাকে হেডস্যারের কাছে নিয়ে গিয়ে বললেন, ভেরি ব্রিলিয়ান্ট। অংকে একশতে একশ পেয়েছে। এক নম্বরও কাটা যায় নাই।

হেডস্যার হাই তুলতে তুলতে বললেন, ও।

বদরুল স্যার আমার দিকে তাকিয়ে আদুরে গলায় বললেন, হাঁদার মতো দাঁড়িয়ে আছিস কেন? হেড স্যারকে কদমবুসি করে দোয়া নে। গাবগাছ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলে হবে? দোয়া নিবি না?

আমি কদমবুসি করলাম। হেডস্যার বিরস গলায় বললেন, মন দিয়ে লেখাপড়া করবি। Knowledge is power মনে থাকে যেন। Knowledge বানান কর দেখি।

আমি নলেজ বানান করলাম। হেডস্যার বললেন, রাস্তাঘাটে যদি কোনো দিন দেখি হাতে বিড়ি সিগারেট তাহলে কিন্তু টান দিয়ে কান ছিঁড়ে ফেলব। ছেঁড়া কান পার্সেল করে মক্কা শরীফে পাঠিয়ে দেব। যা এখন।

বদরুল স্যার আমাকে নিয়ে বের হয়ে এলেন। তিনি অবিশ্যি আমাকে ছেড়ে দিলেন না। নিয়ে গেলেন এসিসটেন্ট হেড স্যারের ঘরে। ঠিক আগের মতো গলায় বললেন, ভেরি ব্রিলিয়ান্ট অংকে একশতে একশ পেয়েছে। এক নম্বরও কাটা যায় নাই। চৌবাচ্চার অংকটা কেউ রাইট করতে পারে নাই। সে রাইট করেছে।

এসিসটেন্ট হ্যাডস্যার হাই তুলতে তুলতে বললেন, কার ছেলে?

'স্টেশন মাস্টার সাহেবের ছেলে। যে সেকেন্ড হয়েছে তার সাথে এই ছেলের একশ আঠারো নম্বরের ডিফারেন্স।'

এসিসটেন্ট হেড মাস্টার সাহেব বিরক্ত গলায় বললেন, মুসলমানের ছেলে – জাত সাপ হয়ে জন্মায়। কিছুদিন পরেই হয়ে যায় ঢোঁরা সাপ। বিষের কারবার নাই। শুধুই ডোরাকাটা। শুধুই ফোঁসফোঁস। দেখবেন এক চান্সে এস এস সি পাস করবে না। অংকে একশ পেয়েছে বললেন না? গোল্লা খাবে সেই অংকে। আমার কথা বিশ্বাস না হলে লিখে রাখেন। অনেক তো দেখলাম।

বদরুল স্যার এসিসটেন্ট হেডস্যারের কথায় মন খারাপ করলেন। তবে দমলেন না। আমাকে নিয়ে গেলেন টিচার্স কমন রুমে। তখন কী জন্যে জানি

আমার চোখে পানি আসি পানি আসি ভাব হল। ফুলের নাম রাখার এই সমস্যা, কারণ ছাড়াই চোখে পানি আসবে। বদরুল স্যার থমথমে গলায় বললেন, ছাগলের মতো কাঁদছিস কেন? খবর্দার কাঁদবি না। বেটাছেলেদের জীবনে একবার মাত্র কাঁদার পারমিশন আছে। Only once. সেই একবারটা একেক জনের জন্যে একেক রকম। কান্না বন্ধ কর। চোখ মুছ।

তিনি পকেট থেকে একটা এক টাকার নোট বের করে বললেন, যা বাদাম কিনে খা। আর শোন বাড়িতে গিয়ে বাবা মা সবাইকে কদমবুসি করে দোয়া নিবি। মুরুব্বিদের দোয়া হল লাইফ জ্যাকেটের মতো। লাইফ জ্যাকেট ছাড়া সমুদ্র পার হওয়া যায় না। দুনিয়াটা হল সমুদ্র। আমি তোর অংক খাতা দেখে খুবই খুশি হয়েছি। আজকে আছরের নামাজের সময় তোর জন্যে খাস দিলে দোয়া করবো। আছর ওয়াক্তের দোয়া কোনোসময় বিফল হয় না। কারন আছর ওয়াক্তে ইউনুস নবী মাছের পেট থেকে নাজাত পেয়েছিলেন এবং আছর ওয়াক্তেই কেয়ামত হবে।

বদরুল স্যারকে আমি খুব পছন্দ করি। শুধু আমি একা না, স্কুলের সব ছাত্র পছন্দ করে। অথচ তিনিই এই স্কুলের সবচে রাগী স্যার। তিনি অনেক ধরনের ধমক দিতে পারেন। তাঁর সবচে কঠিন ধমকের নাম – পিসাব ধমক। এই ধমক যে খায় সে প্যান্ট ভিজিয়ে ফেলে। আবার এমনও ইতিহাস আছে যাকে পিসাব ধমক দিয়েছেন তার কিছু হয় নি কিন্তু তার পাশে বসা ছাত্রের কারবার হয়ে গেছে।

বদরুল স্যারেরও আমার মা'র মতো সমস্যা আছে। স্কুলের বাইরে কোনো ছাত্রকে তিনি চিনতে পারেন না। সালাম দিলে মাথা ঝুকিয়ে সালাম নেন মুখের দিকে তাকান। বিড়বিড় করেন কিন্তু চিনতে পারেন না। একবার আমি রাস্তায় স্যারকে সালাম দিলাম। স্যার সঙ্গে সঙ্গে বললেন – ওয়ালাইকুম সালাম। জি আমি ভালো আছি।

আমার প্যান্টের পকেটে পঞ্চাশ টাকার একটা নোট। পকেটে হাত ঢুকিয়ে আমি নোটটা ধরে আছি এবং খুঁজে বেড়াচ্ছি ভাইয়াকে। তাকে খুঁজে পাওয়া তেমন কঠিন না। বেশির ভাগ সময় ভাইয়া ইস্টিশনের চায়ের স্টলে বসে থাকে। তবে কখনো চা খায় না। চা নাকি তার কাছে মিষ্টি গরম পানির মতো

লাগে। পয়সা খরচ করে গরম পানি খাওয়ার দরকার কী? পানি যত ঠান্ডা তত মজা।

কিছুদিন আগেও ইস্টিশনে দু'টা চায়ের স্টল ছিল—মুসলিম টি স্টল এবং হিন্দু টি স্টল। এখন হিন্দু টি স্টলটা উঠে গেছে। মুসলিম টি স্টলও উঠি উঠি করছে, কাস্টমার নাই। ইস্টিশনের বাইরে নতুন এক চায়ের দোকান হয়েছে – নিউ স্টার রেস্টুরেন্ট। এরা সন্ধ্যার পর হ্যাজাক বাতি জ্বালায়। হিন্দি গান বাজায়। নিউ স্টার রেস্টুরেন্টের মালিক কেন্দুয়া থেকে জিলাপির এক কারিগর এনেছে। বিকালে সেই কারিগর জিলাপি বানায়। এর মধ্যেই জিলাপির নাম ডাক ছড়িয়ে পড়েছে – ধলা সামছুর জিলাপি। সামছু জিলাপি কারিগরের নাম। তার গায়ের রঙ ধবধবে সাদা বলেই সবাই ডাকে ধলা সামছু।

ধলা সামছু সন্ধ্যার পর গোসল করে একটা পাঞ্জাবি পরে রেস্টুরেন্টের বাইরে বেঞ্চির ওপর বসে থাকেন। তাকে তখন কলেজের প্রফেসরের মতো লাগে। ধলা সামছুর কথা বলা রোগ আছে। উনি কথা না বলে থাকতে পারেন না। আমি একদিন সন্ধ্যার পর দু'টাকার জিলাপি কিনতে গেলাম। উনি বললেন, 'তুমি কে গো? নাম কী? নামটা সুন্দর করে বল বাপধন। সুন্দর করে নাম বলতে পারা একটা মোহাব্বত।'

'টগর।'

'উত্তম নাম। জিলাপি কিনবা?'

'হু।'

'দুই টেকার জিলাপি?'

'হু।'

'দুই টেকায় চাইরটা পাইবা। পঞ্চাশ পয়সা কইরা পিস। বাড়িতে মানুষ কয়জন? চাইর পিসে হইব? নিজের দোকান হইলে তোমারে পাঁচ পিস দিতাম। কিন্তু অন্যের দোকান – আমি হইলাম হুকুমের চাকর। আমি নিজে যদি জিলাপি খাইতে চাই আমারে পয়সা দিয়া কিনন লাগব। বুঝলা বিষয়টা?'

'বুঝেছি।'

'জিলাপি খাইতে হয় গরম গরম। ঠান্ডা জিলাপির কোনো মজা নাই। দুইটা জিনিস খাইতে হয় গরম এক জিলাপি, দুই চা। ঠান্ডা জিলাপি আর ঠান্ডা চা দুইই বিষ – এইটা মনে রাখবা। গরম জিলাপি এক কেজি খাইতে পার, কিচ্ছু

হবে না। ঠান্ডা জিলাপি দশটা খাইবা সাথে সাথে পাতলা পায়খানা। টাট্রিঘরে যাইতে হবে দিনে পাঁচবার।’

আমার বাবার ধারণা—সুখি মানুষরা বেশি কথা বলে। বাবা মাঝে মধ্যে জ্ঞানী- জ্ঞানী কথা বলেন। জ্ঞানী কথা বলার সময় তিনি আমাকে ডাক নামে ডাকেন না—ভালো নামে ডাকেন। টগর না ডেকে ডাকেন মোতাহার। আমার ভালো নাম মোতাহার উদ্দিন।

‘বুঝলি মোতাহার। একটা মানুষ সুখী না দুঃখী চট করে বলে ফেলা যায়। ভালোমতো তাকে দেখবি। যদি দেখিস বেশি কথা বলছে তাহলেই বুঝবি সে সুখী মানুষ। আর যদি দেখিস কথাবার্তা কম বলছে তাহলেই বুঝবি—মনের মধ্যে অনেক দুঃখ। সবচে বেশি কথা বলে কারা? পাগলরা। সারাক্ষণই এরা কথা বলে। আশেপাশে মানুষ থাকলে কথা বলে। আশেপাশে কেউ না থাকলে নিজের মনেই বিড়বিড় করে। এই দুনিয়ার সবচে সুখী মানুষ কারা? পাগলরা। একবার কষ্ট করে পাগল হয়ে যেতে পারলে খুবই মজা। আর কোনো দুঃখ নাই। শুধুই সুখ। এইসব ভেবেই পাগল হয়ে যেতে ইচ্ছা করে।’

বাবার জ্ঞানের কথা বেশির ভাগই আমার কাছে মনে হয় ভুল। কারণ ধলা সামছু একজন দুঃখী মানুষ। তার বৌ তাকে ছেড়ে চলে গেছে। কিন্তু বেশি দূর যায় নাই। রোয়াইলবাজারে খারাপ ঘরে জায়গা নিয়েছে। তার ভিজিট দশ টাকা। এইসব বড়দের ব্যাপার। তবে ছোটরাও সবাই জানে। বৌটার নাম সোহাগী। আমি তাকে দেখি নি—শুনেছি ছোটখাট। হাস্যমুখী। অনেক ঢং-ঢাং নাকি জানে। গীতও নাকি গায়। তার কাছে যে যায় সেই খুশি হয়ে আসে। যে একবার গেছে সে পরে আরো পাঁচবার যায়। আমার খুব ইচ্ছা দূর থেকে একদিন তাকে দেখে আসব। দূর থেকে দেখলে তো আর ভিজিট লাগবে না।

ভাইয়া চায়ের দোকানে ছিল না। সে ইস্টিশনের শিমুল গাছের গুঁড়িতে বসে সাইকেলের চেইন ঠিক করছিল। ভাইয়ার চেহারা কিছুদিন আগেও খুব সুন্দর ছিল। এখন দাড়ি গোঁফ গজিয়ে বিশ্রী হয়ে গেছে। কেমন গুন্ডা-গুন্ডা ভাব এসে গেছে। গরম লাগে বলে চুল ছোট ছোট করে কাটে। চুল কাটলে সব পুরুষ মানুষকে প্রথম দু’দিন ‘বান্দরের’ মতো লাগে তারপর ঠিক হয়ে যায়। শুধু ভাইয়ার বেলায় দেখলাম চুল কাটার দশ পনেরো দিন পরেও তার চেহারা থেকে বান্দর ভাব দূর হয় না—বরং বেড়ে যায়। কিছুদিন আগেও তার দাঁতগুলি

মুখের ভেতর ছিল—এখন মনে হয় মুখ ঠেলে বের হয়ে আসতে চাচ্ছে। ভাইয়ার চুল যখন লম্বা থাকে তখন দাঁতগুলি থাকে মুখের ভেতর। চুল ছোট হলেই দাঁত মুখ থেকে বের হয়ে আসে। এটা একটা বিরাট রহস্য।

ভাইয়া সাইকেল থেকে চোখ না তুলে বলল, দৌড় দিয়ে একটা তেনা নিয়ে আয়। ঝড়ের মতো যাবি। সাইক্লোনের মতো ফিরে আসবি।

আমি দৌড় দিলাম না। পকেট থেকে টাকাটা বের করতে করতে বললাম, বাবা এই টাকাটা তোমাকে দিয়েছে।

ভাইয়া টাকার দিকে না তাকিয়ে বলল, তোকে যে বললাম এক দৌড় দিয়ে তেনা নিয়ে আসতে এটা কানে যায় নাই। সাইকেলটা তুলে মাথায় একটা আছাড় দিব?

'টাকাটা নাও, আমি তেনা নিয়ে আসি।'

'টাকা রেল লাইনে ফেলে দে। ঘুষখোর বাপের টাকার ধার রঞ্জু ধারে না।'

আমি টাকাটা পকেটে নিয়ে তেনা আনতে রওনা হলাম। আমি নিশ্চিত তেনা নিয়ে এসে দেখব ভাইয়ার রাগ পড়ে গেছে। ভাইয়ার রাগ আষাঢ় মাসের রোদের মতো। এই আছে এই নাই।

বাবার ধারণা পৃথিবীতে দু'ধরণের মানুষ আছে—নদী মানুষ আর পুকুর মানুষ। নদীর পানি যেমন বয়ে চলে যায়। নদী মানুষের রাগও বয়ে চলে যায়। যে নদী মানুষের স্রোত বেশি তার রাগ তত তাড়াতাড়ি কমে। পুকুর মানুষের রাগ কমে না। ভাইয়া হল খরস্রোতা নদী। এই রাগ উঠে গেছে, এই নাই। আর বাবা হল দিঘি। কিছুতেই রাগ উঠবে না। ভাইয়ার জায়গায় যদি বাবা হত—আর যদি বাবা বলতেন—যা দৌড় দিয়ে একটা তেনা নিয়ে আয়। তার উত্তরে আমি যদি বলতাম, পারব না। তাহলে বাবা বলতেন, না পারলে নাই। সবাই সবকিছু পারে না। তুই হাসি মুখে আমার সামনে বসে থাক এতেই আমি খুশি। মানুষের হাসি মুখের দাম—তিন লাখ টাকা। আর মানুষের বেজার মুখের দাম তিন পয়সা।

তেনা নিয়ে এসে দেখি ভাইয়া পাকা মিস্ত্রির মতো সাইকেলের দু'টা চাকাই খুলে ফেলেছে। তাকে খুবই আনন্দিত মনে হচ্ছে। দেখে মনেই হয় না আজ সকালেই তার ফেল হবার খবর এসেছে।

ভাইয়া তেনা হাতে নিতে নিতে বলল, বাসার অবস্থা কী?

‘অবস্থা ভালো।’

‘আমার ফেল করার কথা শুনে মা কী বলল?’

‘কিছু বলে নাই।’

‘কিছুই বলে নাই?’

‘না। মা’র আধকপালী উঠেছে এই জন্যে দরজা বন্ধ করে শুয়ে আছে।’

‘কুসুম কী বলেছে?’

‘কিছু বলে নাই।’

‘কিছুই না?’

‘উঁহু।’

‘ফেলের খবর শুনে তার মুখটা কি বেজার বেজার হয়ে গেল না হাসি খুশি হয়ে গেল?’

‘বেজার বেজার হয়েছে।’

‘ঠিক তো?’

‘হুঁ ঠিক।’

‘কুসুমকে দেখে কি মনে হয়েছে খবরটা সে ঠিক বিশ্বাস করতে পারছে না।’

‘হুঁ।’

‘হুঁ আবার কী? ঠিক করে বল। কথা বলতে ট্যাক্স লাগে যে হুঁ হাঁ করছিস। কুসুমের মুখ দেখে কী মনে হয়েছে পরিষ্কার করে বল।’

‘মনে হয় বড়ই দুঃখ পেয়েছে।’

‘মুখ দেখে কী করে বুঝলি দুঃখ পেয়েছে। কেউ দুঃখ পেলে কি কপালে লেখা উঠে—‘দুঃখ!’ লেখা উঠে না। মানুষের মুখ দেখে কিছুই বোঝার উপায় নাই। মানুষ খুবই জটিল জিনিস। এরচে যন্ত্র ভালো। যন্ত্র দেখলে বোঝা যায় যন্ত্র ঠিক আছে না, নষ্ট। এখন বল দেখি একটা মানুষ আর একটা সাইকেল এই দুই এর মধ্যে কোনটা ভালো?’

‘সাইকেল।’

‘গুড। হয়েছে। এখন যা ফজলুকে ডেকে নিয়ে আয়। রোদটা অবিশ্যি চড়া উঠেছে। এক কাজ কর সার্টটা খুলে কলের পানিতে ভিজিয়ে মাথার উপর দিয়ে চলে যা। রোদ টের পাবি না, ঠান্ডায় ঠান্ডায় চলে যাবি। পারবি না?’

‘পারব। উনাকে কী বলব?’

‘আসতে বলবি। আজ মনের সাধ মিটিয়ে ঝপাং খেলা খেলব। এক কাজ কর ফজলুর কাছে যাবার আগে কুসুমকে বলে যা সে ঝপাং খেলা দেখতে চেয়েছিল আজ ইচ্ছা করলে দেখতে পারবে।’

‘আচ্ছা।’

ঝপাং খেলাটা খুবই ভয়ংকর। ভয়ংকর বলেই খুব মজার। এই খেলার নিয়ম হল মাগরা নদীর উপর রেলের ব্রীজে চলে যেতে হয়। ব্রিজের উপর রেল লাইনে চুপচাপ বসে থাকতে হয়। সাড়ে চারটার সময় ঢাকা মেইল আসে। ড্রাইভার রেল লাইনের উপর মানুষ বসে থাকতে দেখে দূর থেকে হুইসাল বাজাতে থাকে। ইঞ্জিন কাছাকাছি চলে এলে ঝপাং করে ঝাঁপ দিয়ে মাগরা নদীতে পড়ে যেতে হয়। ইঞ্জিন কতটা দূর থাকতে ঝাঁপ দেয়া হয়েছে এর উপর নির্ভর করে খেলার হারজিৎ। এখন পর্যন্ত ফজলু ভাইকে কেউ হারাতে পারে নি। ফজলু ভাই লাফ দেয় ইঞ্জিন ব্রিজে উঠার পর। অন্য সবাই ইঞ্জিন অনেক দূরে থাকতেই ভয় পেয়ে লাফ দিয়ে পানিতে পড়ে যায়।

আমার খুব ইচ্ছা একদিন ঝপাং খেলাটা খেলি। ক্লাস টেনে উঠার আগে এই খেলা খেলা যায় না। তাছাড়া প্রথমবার এই খেলা খেলতে যাওয়াও খুবই বিপজ্জনক। বাঁকের ভেতর হঠাৎ ট্রেন বের হয়ে আসে। সেটা দেখে হাত পা না কি জমে যায়। ঝাঁপ দেয়ার কথা মনে থাকে না। তখন ধাক্কা দিয়ে পানিতে ফেলে দিতে হয়। তবে একবার এই খেলা খেলে ফেললে ভয় কেটে যায়। তখন বার বারই এই খেলা খেলার ইচ্ছা করে।

ঝপাং খেলা খেলতে হয় দিনে। রাতে এই খেলা কখনো খেলা হয় না— কারণ রাতের বেলা নাকি এগারো বারো বছরের একটা ছেলেকে রেল লাইনে বসে থাকতে দেখা যায়। অনেকেই দেখেছে। ছেলেটা ধবধবে ফর্সা। মাথার চুল কোঁকড়ানো। সে থাকে খালি গায়। পরনে শুধু একটা প্যান্ট। ট্রেন আসার ঠিক আগে আগে হেড লাইটের আলোয় ছেলেটাকে দেখা যায়। সে আপন মনে পাথর নিয়ে খেলে। ট্রেন যে ঝড়ের মতো ছুটে আসছে এদিকে সে ফিরেও তাকায় না। ট্রেনটা যখন ঠিক তার গায়ের উপর এসে পড়ে তখনই সে শুধু উঠে দাঁড়ায়। ট্রেন তার গায়ের উপর দিয়ে চলে যায়। তারপর আর তাকে দেখা যায় না।

ছেলেটার গল্প সবাই জানে। অনেকেই বিশ্বাস করে অনেকে করে না। যেমন আমার বাবা বিশ্বাস করেন। কারণ যে কোনো উদ্ভট গল্প তিনি বিশ্বাস করেন। তাঁর কাছে অসম্ভব বলে কোনো ব্যাপার নেই। এই ছেলেটার ব্যাপারে বাবার বক্তব্য হল – এটা সত্যি হতে পারে। খেলতে খেলতে পুলের উপর চলে গিয়েছিল। সেখানে ট্রেনে কাটা পড়েছে। তারপর থেকে আত্মাটা ঐখানে রয়ে গেছে। তার যে মৃত্যু হয়েছে এইটাই বেচারা জানে না। রোজ হাশর পর্যন্ত বেচারা এইখানে থাকবে। রোজহাশরের দিন আল্লাহপাক তাকে বলবেন—এই ছেলে যা বেহেশতে গিয়ে ঢুকে পড়। সঙ্গে বাবা মা'কে নিতে চাইলে নিয়ে নে। ট্রেন লাইনে অনেক হাঁটাহাঁটি করেছিস আর না। এখন বেহেশতে হাঁটাহাঁটি কর। বেহেশতের ফল ফ্রুট খা। গেলমানদের সঙ্গে মজা করে মারবেল খেল।

কুসুম আপু এইসব গল্প একেবারেই বিশ্বাস করে না। সে প্রায়ই বলে, একবার আমাকে নিয়ে যাস তো। সারারাত পুলের নিচে বসে থেকে ছেলেটাকে দেখব। এ-রকম সত্যি যদি কেউ থাকে হাত ধরে তাকে বাড়িতে নিয়ে আসব।

'সে আসবে তোমার সঙ্গে?'

'অবশ্যই আসবে। মানুষ যেমন আদর বুঝে। ভূত প্রেতও বুঝে। ওকে ঘরে এনে আমি পালবো। একটা ভূত পালার আমার অনেক দিনের শখ।'

আমার সাহস খুব কম তারপরেও ঠিক করে রেখেছি। কোনো এক রাতে কুসুম আপুকে নিয়ে মগরা ব্রিজের নিচে দাঁড়িয়ে থাকবো। রাত দু'টার দিকে যেতে হবে। চিটাগং মেইল রাত দু'টার সময় আসে। এই ট্রেনের সার্চ লাইটের আলো এক মেইল দূর থেকে দেখা যায়। সার্চ লাইটের আলোয় ছেলেটাকে দেখা যাবে।

আমার মাথার উপর ভেজা গামছা। আমি যাচ্ছি ফজলু ভাই-এর খোঁজে। ফজলু ভাই রঞ্জু ভাইয়ার প্রাণের দোস্ত। তিনিও এবার এস. এস. সি. পরীক্ষা দিয়েছেন। রঞ্জু ভাইয়া পাস করতে না পারলেও ফজলু ভাইয়া করেছেন। সেকেন্ড ডিভিশন এবং জেনারেল অংকে লেটার। অংক পরীক্ষার দিন খুব ভালো নকল সাপ্লাই হওয়ায় এই লাভটা তার হয়েছে। যারা ফেল করেছে তারাও অংকে লেটার পেয়েছে।

নিউ স্টার রেস্টুরেন্টের সামনে দিয়ে যাচ্ছি। রেস্টুরেন্ট খালি। বেঞ্চের উপর ধলা সামছু শুয়ে আছেন। আমাকে দেখেই উঠে বসে ব্যস্ত ভঙ্গিতে ডাকলেন—এই ছেলে এই তুমি রঞ্জুর ভাই না?

আমি মাথা নাড়লাম।

'মেট্রিকে তোমার ভাই ফেল করেছে শুনলাম। বড়ই আফসোস। নকলের তো ভালো সুবিধা ছিল, ফেল করল কেন জান?'

'জি না জানি না।'

'চৈত্র মাস। ভেজা কাপড় মাথায় দিয়া হাঁটা ঠিক না। মগজে ঠান্ডা বসে যায়। ভেজা কপড়টা নামাও। আমার কাছে ছাতি আছে নিয়া যাও। পরে ফিরায়ে দিও। এই ছেলে এই... '

ধলা সামছু ব্যাকুল হয়ে আমাকে ডাকছেন, আমি হাঁটতে শুরু করেছি। গরম বাতাস চোখে মুখে লাগছে। চামড়া চিড়বিড় করছে। মনে হচ্ছে মুখের উপর দিয়ে একদল পিঁপড়া হাঁটছে। সব ক'টা পিঁপড়ার মুখে ডিম। এরা ডিম নামিয়ে বিশ্রাম করে। গরম বাতাসের ঝাপ্টা এলেই ডিম মুখে নিয়ে দৌড়তে শুরু করে। পিঁপড়ার পা গুলি ঠান্ডা কিন্তু ডিমগুলো কুসুম কুসুম গরম।

একেক বছর একেক রকম হয়।

গত বছর বৃষ্টিই হয় নি। বড় বড় পুকুর শুকিয়ে গেছে। টিউবওয়েলে পানি উঠে না। এ বছর আগেই বর্ষা নেমে গেল। জ্যৈষ্ঠ মাসেও সারাদিন বৃষ্টি, ঠান্ডা-ঠান্ডা আবহাওয়া। আম কাঁঠাল পাকা বন্ধ। গরমই পড়ে নি আম কাঁঠাল পাকবে কি? অসময়ের বৃষ্টির পানিতে মাগরা নদী ফুলে ফেঁপে উঠল। গভীর রাতে ঘুম ভাঙলে নদীর হাসি শোনা যায়। হিহি হোহো করে নদী হাসে। নদীর হাসি খুব খারাপ। যে বছর নদী হাসে, সেই বছর ভয়ংকর কিছু হবেই। ভৈরব থেকে রেলের ইঞ্জিনিয়াররা একদিন মাগরা ব্রিজ দেখতে এলেন। সুতা ফেলে কি সব মাপজোখ করলেন। তাদের মুখ গম্ভীর হয়ে গেল। তারপর থেকে নিয়ম হল কোনো ব্রিজ সরাসরি মগরা ব্রিজে উঠবে না। ব্রিজে উঠার আগে থামবে। হুইসাল দেবে। একজন পয়েন্টসম্যান সবুজ পতাকা দেখাবে, কিংবা সবুজ বাতি জ্বালাবে। তখনি ট্রেন ব্রিজে উঠবে। নান্দাইল রোড স্টেশনের পয়েন্টসম্যান আব্দুর রহমান চাচা এই খবর শুনে খুবই রেগে গেলেন। চিৎকার, চেঁচামেচি, খারাপ গালাগালি—রেলের সাহেবের মা'রে আমি.....।

বাবা শান্তগলায় বললেন, খারাপ গালাগালি দেবে না। রেল সাহেবের মা নিশ্চয়ই বেঁচে নেই। আর বেঁচে থাকলেও তিনি একজন সম্মানী বৃদ্ধা মহিলা। তাছাড়া তিনি কোনো দোষও করেন নি। তাকে নিয়ে নোংরা কথা বলা ঠিক না। রেলের ডিসিসান তোমার যদি পছন্দ না হয়, চাকরি ছেড়ে দাও।

রহমান চাচা লাফ ঝাঁপ দিতে দিতে বললেন, চাকরি তো ছাড়বই। চাকরির মা'রে আমি.....। এই বৃষ্টি বাদলার দিনে আমি দোষ লাগা পুলের উপর একলা বইস্যা থাকব। আর জিন ভূতে আমারে গলা টিপ্যা মারব। আমার অত গরজ নাই। রেলের চাকরির মা'রে.....।

অনেক লাফ ঝাঁপ দিলেও সন্ধ্যার আগে আগে রহমান চাচা গামবুট পরে রেলের লণ্ঠন নিয়ে রওনা হলেন। গামবুট জোড়া বাবার। গত বর্ষায় কিনেছিলেন। বাবার ধারণা কেনার পরপরই এক সাইজ ছোট হয়ে গেছে। পরার পর আঙুল বেঁকে থাকে। গামবুট জোড়া তিনি রহমান চাচাকে দিয়ে

দিয়েছেন। রহমান চাচার পায়ের পাতা বাবার পায়ের পাতার চেয়েও লম্বা। গামবুট পরার পর তার পায়ের সব কটা আঙুল নিশ্চয়ই বেঁকে থাকে। তবে তাতে তার অসুবিধা হয় না।

মগরা ব্রিজের সামনে এই প্রথম ফ্লাগ ম্যান বসানো হচ্ছে। কাজেই বাবা রহমান চাচার সঙ্গে গেলেন। রহমান চাচাকে জায়গা মতো বসিয়ে তিনি চলে আসবেন। বাবা তাকে অনেক সান্ত্বনার কথাও বললেন—একা একা বসে গাঁজা খাবি। অসুবিধা কী? ট্রেন পার করিয়ে দিয়ে ইস্টিশনে এসে লম্বা ঘুম দিবি। হাঁটাচলা করায় তোর স্বাস্থ্যটাও ভালো থাকবে। গাঁজা খেয়ে শরীরটার তো বারোটা বাজিয়েছিস।

বর্ষা শুরু হবার পর থেকে বাবাকে স্টেশনঘরে ঘুমুতে হচ্ছে। ঘরে থাকার জায়গা নেই। মা বেশ কিছুদিন হল বাবাকে ঘরে থাকতে দিচ্ছেন না। বাবার সঙ্গে কথাও বলছেন না। গরমের সময় হলে বাবা বারান্দায় শুয়ে থাকতে পারতেন। ঘোর বর্ষায় সেটা সম্ভব না। ভাইয়া আবার পরীক্ষা দিচ্ছে বলে সারারাত জেগে পড়ে। ঘুম কাটাবার জন্যে মাঝে মাঝে তাকে বিড়ি খেতে হয়। সিগারেটে ঘুম কাটে না। বিড়িতে লম্বা টান দিলে ঘুম কাটে। কাজেই তার ঘরে সে বাবাকে ঢুকতে দেবে না। রাতে ভাত খাবার পর বাবা পান মুখে দিয়ে ইস্টিশনঘরের দিকে রওনা হন। যেন অনেক দূর দেশে দীর্ঘদিনের জন্যে চলে যাচ্ছেন। কবে ফিরবেন তাও অনিশ্চিত, এমন ভঙ্গিতে সবার সঙ্গে কথাবার্তা বলেন।

ভাইয়ার ঘরে উঁকি দিয়ে বলেন, পড়াশোনা ঠিকমতো হচ্ছে তো। আগে ভাগে বর্ষা নামায় তোর জন্যে ভালো হয়েছে। গরম কমেছে।

ভাইয়া বাবার কোন কথার জবাব দেয় না। কথার মাঝখানে বই এর পাতা উল্টাতে থাকে। তার ভাবটা এ রকম যেন পড়াশোনার মাঝখানে কথা বলায় সে খুবই বিরক্ত।

বাবা এই ঘর শেষ করে যান মা'র ঘরে। হারিকেন নামিয়ে মা'র ঘরের খাটের নিচে অনেকক্ষণ উঁকি ঝুঁকি দেন। সাপ খুঁজেন। প্রতি বর্ষায় মা'র ঘরে একবার না একবার সাপ বের হয়। এবারের বর্ষায় এখনো বের হয় নি। তবে বের হবে এটা প্রায় নিশ্চিত। সাপ খোঁজার ফাঁকে ফাঁকে মা'র সঙ্গে তার

নিশ্চয়ই কোনো কথাবার্তা হয়। কি কথাবার্তা হয় আমি জানি না কারণ দু'জনই কথা বলেন খুব নিচু গলায়।

মা'র ঘর শেষ করার পর বাবা যান রহিমা ফুপুর ঘরে। এই সময় বাবার মেজাজ বেশ ভালো থাকে। তাঁর হাসির শব্দও মাঝে মাঝে শোনা যায়। কুসুম আপুর সঙ্গেও তিনি উপদেশমূলক কিছু কথাবার্তা বলেন। কারণ কুসুম আপুও এবার এস এস সি পরীক্ষা দিচ্ছে। যারা এস এস সি পরীক্ষা দেয় তাদেরকে সব সময় উপদেশ দেয়াই নিয়ম। কুসুম আপুর সঙ্গে কথা বলার সময় বাবার গলা অতিরিক্ত কোমল হয়ে যায়।

'পড়াশোনা কেমন হচ্ছে রে মা?'

'ভালো।'

'একটা কথা খেয়াল রাখবি। সারারাত জেগে পড়বি না। ছেলেরা সারারাত জেগে পড়লে কোনো সমস্যা নাই। সেটাই নিয়ম। কিন্তু মেয়েরা সারারাত জেগে পড়লে সমস্যা।'

'কী সমস্যা?'

'মুখের জ্যোতি কমে যায়।'

'ছেলেদের জ্যোতি কমে না। মেয়েদের কমে কেন?'

'ছেলে মেয়ে সবারই জ্যোতি কমে। ছেলেদের জ্যোতি কমলে কিছু যায় আসে না। মেয়েদের জ্যোতি কমলে যায় আসে। মেয়েদের আসল সম্পদ হল তাদের মুখের জ্যোতি।'

'আপনি কী সব অদ্ভুত কথা যে বলেন চাচা।'

'আমার নিজের কথা না। ময়—মুরুব্বীর কথা।'

'এগুলি মোটেই কোনো ময়—মুরুব্বীর কথা না। আপনার নিজের কথা। আপনি স্টেশনে একা একা জেগে থাকেন আর অদ্ভুত অদ্ভুত সব কথা বানান।'

বাবার নিশ্চয়ই স্টেশন ঘরে একা ঘুমুতে ভালো লাগে না। তিনি নানান অজুহাতে দেরি করতে থাকেন। সবার সঙ্গে কথা শেষ হবার পর বারান্দায় এসে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকেন। এই সময় আমিও বারান্দায় চলে আসি। কারণ তখন খুব মজার একটা ঘটনা ঘটে। মজার ঘটনা সবদিন ঘটে না। মাঝে মধ্যে ঘটে। আমাদের বাসার সামনে দক্ষিণ দিকে কিছু নিচু জায়গা আছে। বর্ষার পানিতে জায়গাটা ডুবে গেছে। প্রায় হাঁটুপানি। স্টেশনে যাবার পথে বাবা

শুকনো জায়গা ছেড়ে হঠাৎ পানিতে নেমে যান। হারিকেন হাতে নিয়ে ছপছপ শব্দে এ মাথা ও মাথা হাঁটেন। রাজ্যের ব্যাঙ তখন বাবাকে ঘিরে লাফালাফি করতে থাকে। কোনো কোনো সাহসী ব্যাঙ লাফ দিয়ে এসে বাবার গায়ে পড়ে। তিনি মনে হয় খুব মজা পান। কারণ আমি বারান্দা থেকে বাবার চাপা গলার হাসি শুনি। বাবার গলার হাসির শব্দ ব্যাঙের ডাকের মতো শোনা যায়। ব্যাঙের রাজত্বে বাবাকে লম্বা একটা ব্যাঙ বলে মনে হয়।

বারান্দায় বাবার সঙ্গে আমারো কিছু কথা হয়। বাবা সংকুচিত গলায় প্রায় অনুরোধের মতো করে বলেন, কিরে আমার সাথে ইস্টিশনঘরে ঘুমুতে যাবি? সিন্দুকের উপর নতুন তুলার তোষক দিয়েছি। শিমুল তুলা। মনে হবে বাতাসের উপর ঘুমুচ্ছিস। আরামের ঘুম হবে। এক ঘুমে রাত কাবার। হিসি করার জন্যেও ঘুম ভাঙবে না।

আমি বলি, না।

‘না কেন? বাপ-ব্যাটায় গল্প করতে করে ঘুমাব। অসুবিধাটা কী?’

অসুবিধা কিছুই নেই। বাবার সঙ্গে ঘুমনো আমার জন্যে আনন্দময় ঘটনা। কিন্তু আমি রাজি হই না মাকড়শার ভয়ে। বর্ষাকাল হল মাকড়শাদের ডিম পাড়ার কাল। আশেপাশের যত মাকড়শা আছে সব পেটে ডিম নিয়ে ইস্টিশনঘরে চলে এসেছে। একটা মাকড়শা ভাতের থালার মতো বড়। চোখ নীল রঙের। অন্ধকারে জ্বলে। এই মাকড়শাটা সোজাসুজি হাঁটে না, কেমন হেলে দুলে হাঁটে।

আব্দুর রহমান চাচাকে মাকড়শাটা দেখিয়ে দিলাম। তিনি গলা নামিয়ে ফিস ফিস করে গোপন সংবাদ দেবার ভঙ্গিতে বলেছেন, বাবা এইটা মাকড় না। এর নাম ধোকড়। অন্য জাত। এরার শইল্যে সামান্য বিষ আছে।

আমি অনুরোধের ভঙ্গিতে বলেছিলাম, কী ভয়ংকর দেখতে। মেরে ফেলেন না।

রহমান চাচা উদাস ভঙ্গিতে বলেছেন, আমি নিরুপায়। তুমি কেন রেলের বড় সাহেব হুকুম দিলেও মারতে পারব না। আমরা ইসলাম ধর্মের মানুষ। ইসলাম ধর্মে মাকড় মারা নিষেধ। কঠিন নিষেধ। মুসলমান না হইয়া আমি যদি হিন্দু হইতাম মাকড় মাইরা সাফ কইরা দিতাম। হিন্দু ধর্মে সাপ মারায় দোষ আছে, মাকড় মারায় নাই। একেক ধর্মে একেক ব্যবস্থা।

‘আমাদের ধর্মে নিষেধ কেন?’

‘একবার একটা মাকড়শা গুহার মুখে জাল বানাইয়া নবিজির জীবন রক্ষা করেছিল। এই জন্য মাকড়শা মারা নিষেধ। গল্পটা শুনতে চাও?’

‘চাই।’

‘তা হইলে বস। কুলি কইরা আসি। গাঁজা খেয়েছি। মুখে দুর্গন্ধ। মুখে দুর্গন্ধ নিয়া নবিজির বিষয়ে কোনো গল্প করলে নেকির বদলে তিনটা বদি লেখা হয়।’

রহমান চাচা কুলি করতে গেলেন। আর ফিরে এলেন না। ফিরে আসার কথাও না। কোন কিছুই তাঁর বেশিক্ষণ মনে থাকে না। তাঁর মাথা আগেই আউলা ছিল। একা একা রাতে বিরাতে মগরা ব্রিজের কাছে বাতি নিয়ে বসে থাকার জন্যে তাঁর মাথা দ্রুত আউলা হচ্ছে। একদিন আমাকে ডেকে গলা নিচু করে বললেন, আবুটার বাড়ি শ্রীহট্ট।

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, কার বাড়ি শ্রীহট্ট?

রহমান চাচা ফিস ফিস করে বললেন, ঐ যে একটা পুলা মগরা ব্রিজের লাইনের উপরে বইস্যা থাকে। তার বাড়ি এই অঞ্চলে না। বাড়ি শ্রীহট্ট।

‘কে বলেছে আপনাকে?’

‘সে নিজেই বলেছে। প্রথম দিকে পুলাটারে বড়ই ভয় পাইতাম। পরে চিন্তা করলাম ভয় পাইয়া আমার লাভটা কী? এখন তার সাথে টুকটাক কথা হয়।’

‘সত্যি?’

‘আমি কি তোমার সঙ্গে মিথ্যা বলতেছি? তোমার সাথে মিথ্যা বললে আমার ফয়দা কী? মিথ্যা কইলে আমার বেতন পঞ্চাশ টেকা বাড়ব না ডিউটি কমবে?’

‘ছেলেটার সাথে কী কথা হয়?’

‘বললাম না, টুকটাক কথা। সেও কম কথা কয়, আমিও কম কথা কই। অধিক কথা বলার তো কোনো সার্থকতা নাই।’

‘ছেলেটার নাম কী?’

‘নাম জিজ্ঞেস করেছিলাম। নাম বলে না। নাম জিগাইলে খলবলাইয়া হাসে।’

‘আর কী করে?’

‘ভেংচি দেয়। পুলাপাইন্যা ভেংচি। মইরা সে ভূত হইছে কিন্তুক পুলাপাইন্যা স্বভাব যায় নাই। পুলাপান ভূত। রেল লাইনের পাথর ঢিল দিয়া নদীতে ফেলে। রেল কোম্পানির ক্ষতি, আমি আবার সেই কোম্পানির নোকর। শেষে একদিন দিলাম ধমক। বললাম, পাথর ফেলবা না এতে লাইন দুর্বল হয়।’

‘ধমক শুনে সে কী করল?’

‘পাথর ফেলেন বন্ধ করছে। আসল কথা হইল বুঝাইয়া বলা। মানুষের যেমন বুঝাইয়া বললে শুনে, ভূত প্রেতরেও বুঝাইয়া বললে শুনে।’

মানুষের মাথা হঠাৎ আউলা হয় না। আস্তে আস্তে আউলা হয়। আব্দুর রহমান চাচার মাথা আউলা হতে শুরু করেছে। কোন একদিন পুরোপুরি আউলা হয়ে যাবে। তখন ভয়ংকর কিছু ঘটবে।

বাবার ধারণা সব মানুষের মাথায় আউলা গাছের বীজ পোঁতা থাকে। সেই বীজ থেকে ছোট্ট চারা বের হয়। চারা বের হওয়া মাত্র গাছ উপড়ে ফেলে দিতে হয়। অনেকেই সেটা করে না। তারা নানান যত্ন আত্তি করে। চারা গাছ দেখতে দেখতে বড় হয়ে যায়। তারা আউলা হয়ে যায়। আউলা গাছের বীজেরও আবার নানান ধরণ। কোনো কোনো বীজ থেকে আদর যত্ন ছাড়াই চারা হয়। দেখতে দেখতে সেই চারা গাছ ডালপালা ছড়িয়ে ঝাকড়া গাছ হয়ে যায়।

‘টগর বুঝলি খুব সাবধান। আউলা গাছের বীজ থেকে চারা গজাচ্ছে কি না খেয়াল রাখবি। শুধু নিজেরটা খেয়াল রাখলে হবে না। অন্যেরটাও খেয়াল করতে হবে। তোর কি মনে হয় এই বাড়ির কারো কারো মাথায় আউলা গাছের বীজ আছে?’

‘কুসুম আপুর মাথায় আছে।’

‘বুঝলি কী করে?’

‘আমার মনে হয়।’

‘প্রমাণ ছাড়া এইভাবে কথা বলা ঠিক না। তোর কাছে প্রমাণ আছে রে ব্যাটা?’

‘না।’

বাবাকে যদিও বলেছি প্রমাণ নেই—আসলে কিন্তু আছে। যে রাতে ঝুম বৃষ্টি হবে সেই রাতে কুসুম আপু অবিশ্যিই ভেতরের বারান্দায় গোসল করবে। সেই

গোসল খুবই রহস্যময়। কারণ কুসুম আপু যখন গোসল করে তখন রহিমা ফুপুর চাপা কাঁদো কাঁদো গলা শোনা যায়, ছিঃ কুসুম। ছিঃ।

কুসুম আপু শান্ত গলায় বলে, এত ছিঃ ছিঃ করবে না। ছিঃ বলার মতো কিছু করছি না।

রহিমা ফুপু বলেন, কী কেলেংকারী! কেউ যদি দেখে।

‘অন্ধকারে দেখবে কী করে? মানুষের চোখে কি টর্চ লাইট ফিট করা?’

তখন রহিমা ফুপুর সত্যিকার কান্না শোনা যায়। রহিমা ফুপু কাঁদেন, কুসুম আপু তাঁকে চাপা গলায় ধমকান।

‘খবরদার মা। ফিঁচ ফিঁচ করবে না। যদি এরকম ফিঁচফিঁচ কর তাহলে ভিতরের বারান্দায় গোসল না করে বাইরে গোসল করব। সত্যি করব।’

ফুপুর কান্না থেমে যায়।

যে সব মেয়ের মাথায় আউলা গাছের বীজ থেকে চারা হয়ে গেছে শুধু তারাই এমন রহস্যময় গোসল করতে পারে।

কুসুম আপু এ বছর পরীক্ষা দিচ্ছে কিন্তু দেখে মনে হয় না পড়াশোনা খুব হচ্ছে। তার প্রধান কাজ ভাইয়াকে বিরক্ত করা। ভাইয়া অন্য সবার মতো পড়ে না, একটু অন্যরকম করে পড়ে। তার পড়া হল মুখস্থ করে পড়া। কখগ একটি সমকোণী ত্রিভুজ। এই বাক্যটা সে কুড়িবার পড়বে। তারপর খাতায় লিখবে ঠিকমতো মুখস্থ হয়েছে কিনা দেখার জন্যে। তারপর সে শুরু করবে পরের বাক্যটা।

কখ এবং কগ তাহার দুইটি বাহু।

কখ এবং কগ তাহার দুইটি বাহু।

কখ এবং কগ তাহার দুইটি বাহু।

জ্যামিতির একটা সম্পাদ্য মুখস্থ করতে তার এক রাত লাগে। মুখস্থ করার সময় হুটহাট করে তার ঘরে কেউ ঢুকলে মুখস্থ জিনিস সব এলোমেলো হয়ে যায়। কুসুম আপু এই কাজটাই করে। হুট করে ঘরে ঢুকে সব এলোমেলো করে দেয়।

এ বছর না কি A Village Fair রচনাটা আসবেই। তিনরাত ধরে ভাইয়া রচনা মুখস্থ করছে। দুই রাতেই তার একটা রচনা মুখস্থ হয়। কুসুম আপুর জন্যেই তিন রাতেও কিছু হচ্ছে না। চোখ বন্ধ করে ভাইয়া রচনা মুখস্থ করা

শুরু করতেই কুসুম আপু সাড়া শব্দ করে দরজার সামনে দিয়ে হাঁটাহাঁটি করা শুরু করে। পরশু রাতেও করেছে। গতকাল রাতেও করেছে। রঞ্জু ভাইয়া বিরক্ত হয়ে বলল, ডিসটার্ব করিস কেন?

কুসুম আপু অবাক হয়ে বলল, ডিসটার্ব কী করলাম?

'এই যে একশবার দরজার সামনে দিয়ে যাচ্ছিস আসছিস ডিসটার্ব হচ্ছে না?'

'তোমার পড়া তুমি পড়বে। ডিসটার্ব হবার কী আছে? পড়ায় মন থাকলে তোমার মাথায় অন্য কিছুই ঢুকত না। কে হাঁটছে, কে কাশছে বুঝতেই পারতে না। তোমার পড়ায় মন নেই। তুমি গত বছর ফেল করেছ। এ বছরও ফেল করবে।'

'আমার ফেল আমি করব। তুই কথা বলার কে?'

'আমি কথা বলার কেউ না। এবার ফেল করলে আমি তোমাকে রূপার একটা মেডেল দেব। মেডেলে লেখা থাকবে-

আখলাক হোসেন

ফেলকুমার

আমি বুঝতে পারছি ভাইয়া অসম্ভব রেগে যাচ্ছে। রাগ সামলাবার চেষ্টা করছে, পারছে না। বাবার কাছে শুনেছি ছোট বেলায় রেগে গেলেই ভাইয়া চিৎকার করে কাঁদত। এখন কাঁদে না। তবে চোখে পানি টলটল করে। ভাইয়ার রাগ চোখের পানি দেখে সবাই বুঝে ফেলে, শুধু কুসুম আপু মনে হয় বুঝতে পারে না। সে ভাইয়ার রাগ আরো বাড়ানোর চেষ্টা করে।

কুসুম আপু ভাইয়ার চোখের পানি সম্পূর্ন অগ্রাহ্য করে বিছানায় বসতে বসতে বলল, তারপর ফেল কুমার, ইংরেজি রচনা কয়টা মুখস্ত হয়েছে?

'একটা।'

'কোনটা, A Village Fair?'

'হু।'

'পুরোপুরি মুখস্থ হয়েছে?'

'একটু বাকি আছে।'

'তোমার কাছ থেকে শুনে শুনে A Village Fair রচনা এ বাড়ির সবার মুখস্থ হয়েছে। একশ টাকা বাজি টগরও এই রচনা মুখস্থ বলে দেবে। আমাদের

বাসায় যে কালো একটা বিড়াল আসে। ঐ বিড়ালটারও রচনাটার প্রথম ছয় লাইন মুখস্থ।’

‘তোর ফালতু কথা শেষ হয়েছে? কথা শেষ হলে যা।’

‘ফালতু কথা শেষ হয়েছে। কাজের কথা বাকি আছে।’

‘কাজের কথাটা কী?’

‘তুমি আমার চুল কেটে দিতে পারবে? লম্বা চুলের জন্যে গরম লাগে ঘুমাতে পারি না। গোসল করলে চুল শুকায় না বিশ্রী লাগে।’

‘এত সুন্দর লম্বা চুল কেটে ফেলবি?’

‘হুঁ কেটে ফেলব।’

ভাইয়া বই বন্ধ করে কুসুম আপুর দিকে তাকাল এবং শান্ত গলায় বলল, কুসুম তুই ঢং করছিস কেন? চুল তুই কোনোদিন কাটবি না। লম্বা চুল তোর নিজের খুব পছন্দের। ঢং করার দরকার কী?

‘ঢং করছি না। আমি আজ রাতেই চুল কাটব। তুমি কেটে না দিলেও আমার কেটে দেবার লোক আছে। টগর কেটে দেবে। কি রে টগর চুল কেটে দিবি না?’

আমি বললাম, না।

কুসুম আপু বলল, আমার চোখের দিকে তাকিয়ে না বল। অন্য দিকে তাকিয়ে না বলছিস কেন?

আমি কুসুম আপুর চোখের দিকে তাকিয়ে না বলতে যাব তার আগেই রহিমা ফুপুর কাশির শব্দ শোনা গেল। এই কাশির অর্থ তিনি জেগে আছেন। মেয়ে কোথায় যাচ্ছে কী করছে খেয়াল রাখছেন। কেশে কেশে তিনি মেয়েকে অনুসরণ করেন।

কুসুম আপু দরজার দিকে তাকিয়ে গম্ভীর গলায় বলল, কাশছ কেন মা?

ফুপু ক্ষীণ গলায় বললেন, কাশ হয়েছে।

কুসুম আপু বলল, তোমার সর্দি কাশি কিছুই হয় নি। তুমি আশে পাশেই আছ এটা জানান দেবার জন্যে তুমি কাশছ। পাহারা দেবে না মা। খবর্দার পাহারা দেবে না। যাও ঘুমাতে যাও। যাও বললাম।

‘চিৎকার করিস না। তোর ফুপুর ঘুম ভেঙ্গে যাবে।’

'তুমি যদি দরজার পাশ থেকে না যাও আমি এমন চিৎকার দেব যে বাজার থেকে লোক ছুটে আসবে।'

'যাচ্ছি, তুই সব সময় এরকম করিস কেন?'

কুসুম আপু বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। খপ করে আমার হাত ধরে বলল, এই টগর আমার সঙ্গে আয় তো।

আমি ভীত গলায় বললাম, কোথায় যাব?

'আমি যেখানে নিয়ে যাব সেখানে যাবি।'

ভাইয়া আমার দিকে তাকিয়ে ভীত গলায় বলল, যেতে বলছে যা। এমন শক্ত হয়ে বসে আছিস কেন?

কুসুম আপু আমাকে নিয়ে তার নিজের ঘরে ঢুকল। ভেতর থেকে দরজার ছিটকিনি দিয়ে দিল। আমি লক্ষ করলাম তার শরীর কাঁপছে। নিশ্চয় রাগে কাঁপছে। এত রাগ করার মতো কোনো ঘটনা তো ঘটে নি। কুসুম আপু আমার দিকে তাকাল। হাসল। তারপর খুবই স্বাভাবিক গলায় বলল, টেবিলের ড্রয়ারে একটা কাঁচি আছে। কাঁচিটা নিয়ে আমার চুল কেটে দে। কচকচ করে কাটবি। চুল কাটার কচকচ শব্দ শুনতে খুব ভালো লাগে। পারবি না?

আমি ভীত গলায় বললাম, পারব না।

'অবশ্যই পারবি। আমি যা বললাম তোকে শুনতে হবে।'

'শুনতে হবে কেন?'

'কারণ আমি কোনো সাধারণ মেয়ে না। আমার শরীরে একটা বিশেষ চিহ্ন আছে। এই চিহ্ন যে সব মেয়েদের থাকে পৃথিবীর সব পুরুষরা তাদের কথা শুনে।'

'বিশেষ চিহ্নটা কী?'

'বুকের ঠিক মাঝামাঝি জায়গায় একটা লাল তিল। দেখতে চাস?'

আমি কিছু বললাম না। চোখ নামিয়ে নিলাম। কুসুম আপুর চোখের দিকে তাকিয়ে থাকতে লজ্জা লাগছে।

'মুখে না বললেও তুই যে দেখতে চাস এটা আমি তোর চোখ দেখেই বুঝতে পারছি। আচ্ছা যা তোকে তিলটা দেখাব। আজ না। অন্য আরেকদিন। কিন্তু খবর্দার, শুধু তিলটাই দেখবি। অন্যকিছু দেখবি না। অন্য কোনো দিকে

যদি চোখ যায় তাহলে আমি কিন্তু কুরুশ কাটা দিয়ে তোর চোখ গেলে দেব। নে এখন আমার চুল কাটতে শুরু কর। খবর্দার হাত কাঁপাবি না।

কুসুম আপু কাঁচি এনে আমার হাতে দিল। আমি চুল কাটছি। বন্ধ দরজার ওপাশ থেকে রহিমা ফুপু বলছেন, দরজা বন্ধ কেন? এই কুসুম দরজা বন্ধ কেন? দরজা বন্ধ করে তুই কী করছিস?

যে সুন্দর সে সব সময়ই সুন্দর। মাথা ভর্তি চুল থাকলেও সুন্দর, চুল না থাকলেও সুন্দর। চুল কাটার পর কুসুম আপুকে কী সুন্দর যে লাগছে। আমি তাকিয়ে থাকি আর অবাক হই। কুসুম আপুর মুখ আগে লম্বা টাইপ ছিল। চুল কাটার পর মুখটা গোল হয়ে গেছে। চোখগুলি হয়ে গেছে টানা টানা। আমার ধারণা সবার কাছেই কুসুম আপুকে সুন্দর লাগছে। শুধু রহিমা ফুপুর লাগছে না। তিনি মেয়ের দিকে তাকালেই মুখ কাঁদো কাঁদো করে বলেন—“মেয়েটাকে বান্দরের মতো লাগছে। ছিঃ ছিঃ কী সর্বনাশ। দুই দিন পরে আমি মেয়ের বিয়ে দিব। কোমর পর্যন্ত চুল আসতে লাগবে দশ বছর। আমার কী সর্বনাশ হয়ে গেল।”

কুসুম আপু তার উত্তরে ঝগড়া করে না। খিল খিল করে হাসে এবং বলে, তোমার সর্বনাশ হবে কেন। আমার বিয়ে না হলে আমার সর্বনাশ। তোমার কী?

চুল ছোট করার পর কুসুম আপুর রাগও মনে হয় পড়ে গেছে। পড়ায় মন বসেছে। এখন আর ভাইয়ার সঙ্গে ঝগড়া করে না। রাতে বৃষ্টি নামলে অদ্ভুত গোসলও করে না। অনেক রাত পর্যন্ত দরজা বন্ধ করে পড়াশোনা করে। দরজা বন্ধ থাকে বলে রহিমা ফুপু ঘুমাতে যেতে পারেন না। বারান্দায় চৌকির উপর বসে থাকেন। হঠাৎ হঠাৎ মা তাকে তার ঘরে ডেকে নিয়ে যান। খুব নিচু গলায় দু’জনের মধ্যে কথা হয়। নিশ্চয়ই বিশেষ কোনো কথা, কারণ তাদের কথা শেষ হবার পর রহিমা ফুপু ঘর থেকে কাঁদতে কাঁদতে বের হন। মা নিজেও কাঁদতে থাকেন। এবং হুট করে তাঁর আধকপালী মাথা ব্যথা শুরু হয়। মা কাউকে চিনতে পারেন না।

মা’র হাসি কান্না কোনোটাকেই আমরা তেমন গুরুত্ব দেই না। খুব ছোট বেলা থেকেই দেখছি মা কারণ ছাড়াই হাসেন। আবার কারণ ছাড়াই কাঁদেন। তার মানে এই না যে তার মাথার ঠিক নেই। সব মানুষ এক রকম হয় না। একেক মানুষ হয় একেক রকম।

মে মাসের ২৮ তারিখ থেকে এস এস সি পরীক্ষা শুরু হবে। প্রথম দিনে বাংলা। ভাইয়ার পরীক্ষার প্রিপারেশন শেষ। শুধু বাকি ছিল নিন্দালিশের পীর সাহেবের নিজের হাতের লেখা তাবিজ। এই তাবিজও যোগাড় হয়েছে। এই তাবিজের নিয়ম হল যেদিন পরীক্ষা শুরু হবে সেদিন ফজরের নামাজের পর তাবিজটা ডানহাতের কব্জিতে পরতে হবে। পড়ার সময় তিনবার বলতে হবে— "রাব্বি জেদনি এলমান।" এর অর্থ হে রব তুমি আমাকে জ্ঞান দাও। যে ক'দিন তাবিজ বাঁধা থাকবে সে ক'দিন ফজরের নামাজ কাজা করা যাবে না, মিথ্যা কথা বলা যাবে না, চুল নখ কাটা যাবে না। শেষ পরীক্ষা হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে স্রোতস্বিনী নদীতে তাবিজটা ফেলে দিতে হবে। তাবিজ ফেলার পরও সব শেষ না। কিছু কাজ বাকি, মাথা কামিয়ে সেই চুলও ঠিক তাবিজ যেখানে ফেলা হয়েছে সেখানে ফেলে দিতে হবে। মাথার কাটা চুল পানিতে ডুবে গেলে উদ্দেশ্য সফল ধরে নিতে হবে। আর চুল যদি পানিতে ভেসে থাকে তাহলে সর্বনাশ।

নিন্দালিশের পীর সাহেব সবাইকে এই তাবিজ দেন না। পীরসাহেবের এক মুরিদের হাতে পায়ে ধরে ভাইয়া তাবিজ জোগাড় করেছে। পরীক্ষা নিয়ে ভাইয়ার মনে সামান্য দুঃশ্চিন্তা ছিল। তাবিজ পাওয়ার পর দুঃশ্চিন্তা দূর হয়েছে।

ভাইয়ার সিট পরেছে আঠারো বাড়ি হাই স্কুলে। ভাইয়ার ধারণা এটাও আল্লাহপাকের খাস রহমত। আঠারো বাড়ির সেন্টার নকলের জন্যে খুবই বিখ্যাত। এই সেন্টারের শিক্ষকরাও নকলের ব্যাপারে সাহায্য করেন। হঠাৎ কোনো ম্যাজিস্ট্রেট চলে এলে শিক্ষকরা ছুটে গিয়ে ছাত্রদের খবর দেন। যে যার বই খাতা যাতে লুকিয়ে ফেলতে পারে।

এমন সুযোগ সুবিধার পরেও কী যে হল—পরীক্ষার ঠিক আগের দিন— ২৭শে মে, ভাইয়া আমাকে ডেকে শিমুল গাছের নিচে নিয়ে গেল। গলা নিচু করে বলল, সিদ্ধান্ত নিয়েছি পরীক্ষা দিব না।

আমি কিছু বললাম না। তাকিয়ে রইলাম।

'পরীক্ষা দিয়ে লাভ নাই। মাথার ভেতর সব আউলা হয়ে গেছে। ধর পরীক্ষা দিয়ে যদি পাশও করি—তিন ডাণ্ডার পাশ হবে। তিন ডাণ্ডা বুঝিস তো থার্ড ডিভিশন। এদিকে কুসুম পাবে ফার্স্ট ডিভিশন। এক ডাণ্ডা! লজ্জার ব্যাপার না?'

'হুঁ।'

‘এরচে পরীক্ষা না দেয়া ভালো। ঠিক কি না তুই নিজেই বল।’

‘ঠিক।’

‘আমি তো থাকব না। তুই খবরটা সবাইকে দিবি।’

‘তুমি যাচ্ছ কোথায়?’

‘এখনো কিছু জানি না। সাইকেল নিয়ে বের হই। সাইকেলের চাক্কা যে দিক যাবে-আমিও যাব সেই দিকে।’

ভাইয়ার সাইকেলের ক্যারিয়ারে কাপড়ের একটা ব্যাগ। হ্যান্ডেলে আরেক ব্যাগ। পানির একটা বোতল। ভাইয়ার মাথায় ক্রিকেট খেলোয়াড়দের টুপির মতো টুপি। তাকে দেখাচ্ছে ভূপর্যটকের মতো। শার্টের পকেট থেকে সানগ্লাস বের হয়ে আছে। আমি বললাম, তুমি ফিরবে কবে?

ভাইয়া উদাস গলায় বলল, কিছুই জানি না। নাও ফিরতে পারি।

আমি তাকিয়ে আছি। ভাইয়া সাইকেল নিয়ে রেল লাইনের পাশের রাস্তায় পায়ে চলা পথে উঠে পড়ল। দৃশ্যটা দেখতে এত ভালো লাগছে। মনে হচ্ছে এই সাইকেল চলতেই থাকবে। কোনোদিন থামবে না। ভাইয়া একবার পেছনে ফিরে হাসল। সেই হাসিটাও এত সুন্দর। সুখী মানুষের হাসি।

মগরা ব্রিজের দু'পাশে তাঁবু পড়েছে। শাদা রঙের তাঁবু। রেলের ইঞ্জিনিয়ার এসেছেন, সঙ্গে অনেক লোকজন। মালগাড়িতে করে রোজই কিছু না কিছু আসছে। সবচে বেশি আসছে বালির বস্তা। চটের ব্যাগ ভর্তি বালির বস্তায় ছোটখাট পাহাড়ের মতো হয়ে গেছে। মাটি কাটার একটা ক্রেন এসেছে। হলুদ রঙের এই ক্রেনটা যখন চলে তখন শকুনের বাচ্চার কান্নার মত শব্দ উঠে। ক্রেন যে চালায় সে মোটাসোটা থলথলে ধরণের মানুষ। তার চোখ সব সময় বন্ধ থাকে। মনে হয় সে ঘুমিয়ে ঘুমিয়েই ক্রেন চালায়। তাকে সারাক্ষণ বকা শুনতে হয়। ইঞ্জিনিয়ার সাহেব তাকে বকেন।

'এই জমশেদ, এই জম্বু, ঘুমাচ্ছ নাকি? চোখ বন্ধ করে কি করছ? হ্যালো, হ্যালো।'

জমশেদ নামের লোকটা চোখ মেলে ফিক করে হেসে আবার চোখ বন্ধ করে ফেলে। ইঞ্জিনিয়ার সাহেব রাগে কাঁপতে থাকেন। গলার রগ ফুলিয়ে চেঁচাতে চেঁচাতে বলেন, তোমার নামে আমি হেড অফিসে রিপোর্ট করব। তুমি চাকরি কী করে কর আমি দেখব। চোখ বন্ধ করে ফাজলামি?'

ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের নাম—কামরুল ইসলাম। তার বয়স নিশ্চয়ই বেশি কিন্তু মাঝে মাঝেই তাকে কলেজের ছেলেদের মতো দেখায়। ভদ্রলোকের গায়ের রঙ শ্যামলা। চেহারা খুবই সুন্দর। শাদা রঙ মনে হয় তার খুব পছন্দ। বেশির ভাগ সময় তার পরনে থাকে শাদা প্যান্ট এবং শাদা গেঞ্জি। মাথায় বারান্দাওয়ালা শাদা টুপিও তার ছিল। প্রথম দিনেই বাতাসে সেই টুপি, তার মাথা থেকে উড়ে গিয়ে মগরা নদীতে পড়ল। তিনি অতি ব্যস্ত হয়ে বললেন, টুপিটা রেসকিউ করার ব্যবস্থা কর। কুইক কুইক!

কেউ নড়ল না।

ইঞ্জিনিয়ার সাহেব প্রায় কাঁদো কাঁদো হয়ে বললেন, আমার এটা খুব শখের টুপি। জাপান থেকে কেনা। আমি সাঁতার জানি না। জানলে নিজেই তুলতাম কেউ তুলে দিন বখশিশ পাবেন। ভালো বখশিশ দিব।

বখশিশের ঘোষণাতেও কাজ দিল না। ইঞ্জিনিয়ার সাহেব অসহায়ভাবে টুপির দিকে তাকিয়ে ছটফট করছেন। উপস্থিত দর্শকদের এই দৃশ্য দেখতেই

বেশি ভালো লাগছে। টুপি তুলে ফেললে তো আর এমন মজার দৃশ্য দেখা যাবে না। টুপিটা ব্রিজের মাঝখানের স্প্যানের সঙ্গে লেগে ঘুরপাক খাচ্ছে। মনে হচ্ছে টুপিটাও মজা পাচ্ছে। ডুবতে গিয়েও ডুবছে না।

‘একশ টাকা বখশিশ। একশ টাকা। আমার খুব শখের টুপি। ওয়ান হান্ড্রেড রুপিস।’

একশ টাকা ঘোষণা দেবার পর রহমান এন্ড ব্রাদার্স আইস ফেক্টরির এক কুলিকে লুঙ্গি মালকোচা করে এগুতে দেখা গেল। দর্শকরা সবাই তাতে খুব মজা পেল। হাত তালি দিতে শুরু করল। একজন চিৎকার করে বলল—“সাবাস মজনু। সাবাস।”

মজনু পানিতে নেমে পড়ল মহাবিপদে। প্রবল স্রোত তাকে কাবু করে ফেলছে, সে টুপি পর্যন্ত যেতে পারছে না। তাকে ভাটির দিকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। পাড়ে উঠে সে আবারো শুরু করে। দর্শকরা নানান উপদেশ দেয়, উজান থেকে শুরু কর। ভাটি থেকে সাঁতার দিয়ে যাবি কীভাবে? গাধা নাকি। শরীরে শক্তি নাই? এই তুই ভাত খাস নাই? এক হাত দিয়ে লুঙ্গিটা ধররে গাধা। তোর কালা পুটকি দেখা যায়। হি হি হি।

টুপি উদ্ধার হল না। হাঁপাতে হাঁপাতে মজনু যখন স্প্যানের কাছে উপস্থিত হয়েছে তখন টুপি ডুবে গেছে। তারপরেও ইঞ্জিনিয়ার সাহেব মজনুকে একশ টাকা বখশিশ দিলেন। মজনু টাকা হাতে নিয়ে সবার দিকে তাকিয়ে বোকার মতো হাসতে লাগল।

জাপানি টুপির কারণে প্রথম দিনেই ইঞ্জিনিয়ার কামরুল ইসলাম সাহেবের নাম হয়ে গেল জাপানি ইঞ্জিনিয়ার। আমরা খুব আগ্রহের সঙ্গে জাপানি ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের কর্মকান্ড লক্ষ করতে লাগলাম।

জাপানি ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের কর্মকান্ড অবিশ্যি লক্ষ করার মতোই। তিনি দিনের মধ্যে বেশ কয়েকবার রেলের স্লীপারে পা রেখে দৌড়ান। দৌড়ের সময় সাপের শীস দেবার মতো শব্দ করেন। প্রতিদিন সন্ধ্যার আগে আগে ব্রিজের মাঝখানের স্প্যানে পা ঝুলিয়ে বসে গান করেন। তিনি একটা গানই বোধহয় জানেন—“আমি অধম জেনেও তো কিছু কম করে মোরে দাও নি।” তখন তার পাশে টকটকে লাল রঙের একটা ফ্লাক্স থাকে। গানের ফাঁকে ফাঁকে ফ্লাক্স থেকে চা ঢেলে চুক চুক করে খান। এবং অবাক হয়ে নদীর স্রোতের দিকে

তাকিয়ে থাকেন। তার দৃষ্টি বেশির ভাগ সময় থাকে যেখানে টুপি ডুবে গিয়েছিল সেইখানে।

বাবা একদিন দাওয়াত করে ভদ্রলোককে আমাদের বাসায় নিয়ে এলেন। রহিমা ফুপু অনেক পদ রান্না করলেন। কলার থোড় ভাজি, ঢেড়স ভর্তা, সরিষা ভর্তা, আলু দিয়ে মুরগি, মাছের ঝোল, টেংরা মাছের টক। কাচা মরিচ দিয়ে হিদল ভর্তা। বাবা হাত কচলাতে কচলাতে বললেন- নিজ গুনে ক্ষমা করবেন স্যার। দরিদ্র আয়োজন। আমার স্ত্রীর শরীরটা খারাপ। সে কিছু করতে পারে নি। তার শরীর ভালো থাকলে.....।

জাপানি ইঞ্জিনিয়ার অবাক হয়ে বললেন—দরিদ্র আয়োজন মানে? এর নাম দরিদ্র আয়োজন? দরিদ্র আয়োজন কাকে বলে যদি দেখতে চান—আমার খাবার একদিন খেয়ে যাবেন। স্রেফ ভাত আর ডিম সিদ্ধ। সেই ভাতও কোনোদিন হচ্ছে জাউ, কোনোদিন লোহার মতো শক্ত।

'স্যার আপনার যখনই ইচ্ছা করবে আমার বাড়িতে খেয়ে যাবেন। এটা আপনার নিজের বাড়ি বলে বিবেচনা করবেন। আমার রিকোয়েস্ট।'

'রোজ এসে আপনার বাড়িতে খেয়ে যাব?'

'জি স্যার। রিজিকের মালিক আল্লাহপাক। আল্লাহপাক যদি আমার বাড়িতে আপনার রিজিক ঠিক করে রাখে তাহলে এখানেই খাবেন। আমি বড় খুশি হব স্যার। 'ভেরি হ্যাপী' হব।'

বাবা বিশিষ্ট মেহমানদের সামনে কথায় বার্তায় ইংরেজি বলতে পছন্দ করেন এবং হাত কচলাতে থাকেন। তখন তাঁর চেহারার মধ্যেই চাকর চাকর ভাব চলে আসে। তিনি যে বিনয়ের বাড়াবাড়ি করছেন এটা সবার চোখে পড়ে শুধু তাঁর চোখে পড়ে না।

বাবার ভাগ্য খারাপ তিনি সামনে বসিয়ে মেহমান খাওয়াতে পারলেন না। তাকে ইস্টিশন চলে যেতে হবে। 'আঠারবাড়ি' স্টেশনে মালগাড়ি লাইন থেকে পড়ে গেছে। তাকে স্টেশনে থেকে আঠারবাড়ি স্টেশনের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে হবে।

মেহমানদারির দায়িত্ব পড়ল কুসুম আপুর উপর। মেহমানদারি মানে ভাত শেষ হবার আগেই প্লেটে ভাত দিয়ে দেয়া। তরকারি নিয়ে সাধাসাধি। মেহমান 'না' বলে দু'হাতের দশ আঙুল মেলে প্লেট ঢাকবেন। সেই আঙুলের ফাঁক দিয়ে

তরকারি দিয়ে দিতে হবে। পাতে তরকারি চলে যাবে কিন্তু আঙুল ভিজবে না। এই জাতীয় কাজ কুসুম আপু কখনো করে না, আজ দেখি খুব উৎসাহ নিয়ে করছে। বয়স্ক মহিলাদের মতো বলছে—একবার দিতে হয় না, দু'বার দিতে হয়। হাত সরান আমি দু'বার দেব। হাত না সরালে আমি আপনার হাতে তরকারি ঢেলে দেব।

ভদ্রলোক বিস্মিত হয়ে হাত সরাতে সরাতে বললেন, একবার দিলে কী হয়?

কুসুম আপু বলল, একবার দিলে আদরের বৌ মরে যায়।

'সে কি আমি তো জানি একবার দিলে খালে পড়ে।'

'বৌ মরা আর খালে পড়া একই জিনিস।'

'আমার তো বৌ নেই, বৌ মরার প্রশ্ন আসছে না।'

'এখন নেই পরেতো হবে। সেই বৌ মরে যাবে। অবিশ্যি বৌ যদি আদরের হয়। অনাদরের বৌ হলে মরবে না। আপনাকে যন্ত্রণা দেবে।'

ভদ্রলোককে দেখেই বুঝেছি কুসুম আপুর কথাবার্তায় তিনি চমকে গেছেন। আমরা কুসুম আপুর অদ্ভুত কথাবার্তায় চমকাই না, শুনে শুনে অভ্যস্ত। ভদ্রলোক তো আর শুনেন নি। তাছাড়া কুসুম আপুকে দেখাচ্ছিল পরীর মতো। মেট্রিক পরীক্ষা উপলক্ষে বাবা যে শাড়িটা দিয়েছেন আপু সেই শাড়ি পরেছে। কপালে টিপ দিয়েছে। আমাদের বাড়িতে কপালে টিপ দেয়া খুবই খারাপ ব্যাপার বলে গণ্য করা হয়। টিপ দেয়া আর সিঁদুর দেয়া একই। এতে হিন্দুয়ানী করা হয়। বিয়ের পর দেয়া যায় তবে বিয়ের আগে দিলে স্বামী পর নারীতে আসক্ত হয়। মুসলমান মেয়ের হিন্দুয়ানী করার এই হল শাস্তি। কুসুম আপু পরেছে, কারণ সে নিয়ম কানুন মানে না।

আপুকে শাড়িতে খুবই মানিয়েছে। সবুজ শাড়ির সঙ্গে লাল টিপটাতেও মানিয়েছে। আমি তাকে কত ছোট থেকে দেখছি এই আমিই চোখ ফেরাতে পারছি না। জাপানি ইঞ্জিনিয়ার বাইরের মানুষ সে তো মুগ্ধ হবেই। তাছাড়া কুসুম আপুর শরীরে আছে বিশেষ একটা চিহ্ন। এই চিহ্ন থাকলে পুরুষ মানুষ তার আশেপাশে এলেই ফণা নামিয়ে ফেলবে। সাপের মতো সব পুরুষ মানুষেরও ফণা আছে। খুব বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া পুরুষ মানুষ ফণা নামাতে পারে না। (এটা আমার কথা না। কুসুম আপুর কথা।)

জাপানি ইঞ্জিনিয়ার ভাত খেতে খেতেই ফণা নামিয়ে ফণাবিহীন সাধারণ সাপ হয়ে গেলেন, তার চেহারার মধ্যে গদগদ ভাব চলে এল। মুখের চামড়া হঠাৎ তেলতেলে হয়ে গেল। তিনি হড়বড় করে কুসুম আপুর সঙ্গে অনর্গল কথা বলতে লাগলেন। একটা কথার সঙ্গে অন্য একটা কথার কোনো মিল নেই। তিনি কী বলছেন নিজেও বোধ হয় জানেন না।

'কুসুম তুমি কি গল্পের বই পড়। আমি প্রচুর গল্পের বই নিয়ে এসেছি। সময় যখন কাটে না বই পড়ি। অবিশ্যি সবই ইংরেজি থ্রিলার। তুমি ইংরেজি বই পড়তে পার না? অভ্যাস করলেই পারবে। একটা ইংলিশ টু বেঙ্গলি ডিকশনারি নিয়ে বসতে হবে। যে সব শব্দের অর্থ বুঝতে পার না—চট করে ডিকশনারি খুলে দেখে নেবে। এতে একটা ক্ষতি আছে আর একটা লাভ। ক্ষতি হচ্ছে পড়াটা স্লো হয়ে যাবে। আর লাভ হচ্ছে ওয়ার্ড পাওয়ার বাড়বে। কুসুম, ডিকশনারি নিয়ে মজার একটা জোক মনে পড়েছে। খুবই মজার—হা হা হা। জোকটা শোন—পাগলা গারদের এক রোগী। তার খুবই বই পড়ার নেশা। যে বই তাকে দেয়া হয় সেই বইই চট করে পড়ে ফেলে। আরো বই চায়। পাগলা গারদের লাইব্রেরিয়ান তাকে বই দিতে দিতে ক্লান্ত। সব বই সে পড়ে ফেলেছে। অথচ রোগী বই চায়। লাইব্রেরিয়ান তখন করল কি তাকে মোটা ডিকশনারিটা দিয়ে দিল। ও আচ্ছা গল্পটায় সামান্য ভুল করলাম, ডিকশনারি না লাইব্রেরিয়ান তাকে দিয়ে দিল আটশ পৃষ্ঠার টেলিফোন ডিরেক্টরি। টেলিফোন ডিরেক্টরি কি তুমি জানতো? টেলিফোন ডিরেক্টরিতে এলফাবেটিকেলি টেলিফোন গ্রাহকদের নাম লেখা থাকে আর টেলিফোন নাম্বার লেখা থাকে। যাই হোক লাইব্রেরিয়ান টেলিফোন ডিরেক্টরি দিয়ে মহা খুশি। পাগল পরদিনই বলতে পারবে না, বই পড়ে শেষ করে ফেলেছি। ঘটনা হল কি পাগলটা পরদিনই টেলিফোন ডিরেক্টরি ফেরত দিয়ে বলল, "স্যার পড়ে ফেলেছি আরেকটা বই দেন।" লাইব্রেরিয়ান অবাক হয়ে বলল, বইটা কেমন লাগল? পাগল বলল, উপন্যাসটা খারাপ না, তবে স্যার চরিত্রের সংখ্যা অনেক বেশি। মনে রাখতে গিয়ে কষ্ট হয়েছে। হা হা হা। জোকটা কেমন কুসুম?'

কুসুম আপু জবাব দেবে কী সে এমন হাসতে লাগল যে হেঁচকি উঠে গেল। দমবন্ধ হয়ে যাবার মতো হল। জাপানি ইঞ্জিনিয়ার খুবই ব্যস্ত হয়ে

গেলেন, পানি খাও তো কুসুম। পানি খাও। তোমাকে তো আর কখনো জোক বলা যাবে না। কী সর্বনাশ। এমন করে কেউ হাসে?

দুপুরে খেয়েই কামরুল সাহেব চলে যাবেন এমন কথা ছিল – তার ভয়ংকর জরুরি কাজ। কিন্তু তিনি সব কাজ ফেলে সন্ধ্যা পর্যন্ত রয়ে গেলেন এবং সন্ধ্যা পর্যন্ত তিনি অনর্গল কথা বললেন। সবই জাপানের গল্প। তিনি জাপানে গিয়ে জাপানের সী ফুড রেস্টুরেন্টে খেতে গিয়েছেন। কোনো খাবার দাবারের নাম জানেন না, শেষে চেহারা দেখে পছন্দ করে একটা খাবার খেলেন। খেতে বেশ ভালো সামান্য টক-টক। তিনি খুবই আগ্রহ করে খেলেন শেষে জানা গেল সেটা ছিল সামুদ্রিক সাপ।

কুসুম আপু চোখ কপালে তুলে বললেন, আপনি সাপ খেলেন?

'হ্যাঁ খেলাম। জেনেশুনে তো খাই নি। না জেনে খেয়েছি। তবে পরে অবিশ্যি জেনে শুনে খেয়েছি।'

'আপনি জেনেশুনে সাপ খেয়েছেন?'

'হুঁ খেয়েছি। কী করব অন্য কোনো খাবার খেতে পারি না। শেষের দিকে সী ফুড রেস্টুরেন্টে গেলেই সাপের ঝোলের অর্ডার দিতাম।'

'আমার তো শুনেই বমি এসে যাচ্ছে।'

'বমি আসার কী আছে। রান্না করা সাপ খাচ্ছি। কাঁচা তো খাচ্ছি না।'

কুসুম আপু গাল ফুলিয়ে বলল, আপনি আর সাপ খাবেন না। কোনোদিন না।

ভদ্রলোক আনন্দের হাসি হাসতে হসতে বললেন, আরে তোমাকে নিয়ে তো ভাল ঝামেলা হল। সাপ আর মাছের মধ্যে বেশি কম তো কিছু নেই। বাইন মাছ খাও না? বাইন মাছ খেতে পারলে সাপ খেতে সমস্যা কী?

কুসুম আপু কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, না, সাপ খেতে পারবেন না। আপনি কথা দিন আর সাপ খাবেন না।

উনি হাল ছেড়ে দেয়ার ভঙ্গি করে বললেন, আচ্ছা যাও খাব না।

বলেই তিনি ছোট্ট করে নিঃশ্বাস ফেললেন, যেন সাপ খেতে না পারার দুঃখে তিনি খুবই কাতর হয়েছেন। তার মন পড়ে আছে সাপের ঝোলে।

সন্ধ্যার আগে আগে জাপানি ইঞ্জিনিয়ার তাঁবুর দিকে রওনা হলেন। আমার ধারণা আমরা কেউ যদি একবার বলতাম—রাতের খাওয়া খেয়ে যান, তিনি সঙ্গে

সঙ্গে রাজি হয়ে যেতেন। ভদ্রলোক আমাকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন। তার কাছে নাকি কিছু ম্যাগাজিন আছে। ম্যাগাজিনগুলো দিয়ে দেবেন। কুসুম আপু পড়বে।

রেল লাইনের স্লীপারে পা রেখে লাফিয়ে লাফিয়ে তিনি যাচ্ছেন। সাপের শীসের মতো শব্দ করছেন। তাকে দেখেই মনে হচ্ছে তিনি খুবই মজা পাচ্ছেন। যেতে যেতে আমার সঙ্গেও কিছু কথা হল। আমাদের এই অঞ্চলে দেখার মতো কি আছে। এখানে কবে হাট বসে। হাটে কী পাওয়া যায়।

কথা বলার জন্যে কথা বলা।

ভদ্রলোক আমাকে তাঁবুর বাইরে রেখে নিজে তাঁবুতে ঢুকে গেলেন। আমার খুব শখ ছিল তাঁবুর ভেতরটা দেখার। উঁকি ঝুঁকি মেরেও কিছু দেখা যাচ্ছে না। তাঁবুর মুখে পর্দা দেয়া। বেশ ভারী পর্দা। বাতাস হচ্ছে, কিন্তু বাতাসে পর্দা কাঁপছে না। তাঁবুর ভেতর থেকে অষুধ অষুধ গন্ধ আসছে।

তিনি বের হলেন টিনের একটা কৌটা নিয়ে। হড়বড় করে বললেন, ম্যাগাজিন গুলি খুঁজে পাচ্ছি না। রাতে খুঁজে রাখব। খোকা তুমি কাল একবার এসে নিয়ে যেতে পারবে না?

আমি বললাম, পারব।

তিনি বললেন, না থাক তোমার আসতে হবে না। বাচ্চা মানুষ একা একা এত দূর আসবে। আমিই কাউকে দিয়ে পাঠাব। কিংবা নিজেও আসতে পারি। বিকেলে এসে এক কাপ চা খেয়ে গেলাম ম্যাগাজিনগুলিও দিয়ে গেলাম। আইডিয়াটা কেমন?

'ভালো।'

'বেশ তাহলে তুমি যাও। ধর এই কৌটাটা নিয়ে যাও। রোস্টেড পিনাট। চীনা বাদাম। তোমার আপাকে দিও। আর এই চিঠিটাও দিও। ম্যাগাজিনগুলো যে খুঁজে পাই নি সেটা লিখে দিয়েছি। বেচারিকে বলে এসেছিলাম ম্যাগাজিন পাঠাব। সে হয়তো আশা করে আছে। কোনো জিনিসের জন্য আশা করে থাকলে সেই জিনিস না পাওয়া গেলে খুবই কষ্ট হয়। আর শোন আমি যে কাল আসব এটাও বলার দরকার নেই। কারণ নাও আসতে পারি। কাজের চাপ খুব বেশি।'

'জি আচ্ছা।'

'অন্ধকার হয়ে গেছে একা একা যেতে পারবে তো?'

‘পারবো।’

‘দাঁড়াও তোমাকে একটা টর্চ লাইট দিয়ে দেই।’

তিনি আবার তাঁবুর ভেতর ঢুকে গেলেন। টর্চ লাইট সম্ভবত খুঁজে পাচ্ছিলেন না। তাঁবু থেকে মুখ শুকনো করে বের হলেন হাতে সবুজ রঙের অদ্ভুত এক টর্চ।

‘খোকা শোন টর্চটা আমাকে ফেরৎ দিতে হবে। আমার শখের জিনিস। হারায় না যেন।’

‘আমার টর্চ লাগবে না।’

‘অবিশ্যি লাগার কথা না। এখনো আলো আছে। তাহলে টর্চটা বরং থাকুক। হারিয়ে ফেললে গেল। এইসব জিনিস বাংলাদেশে পাওয়া যায় না। বরং এক কাজ করি আমি তোমাকে এগিয়ে দেই।’

‘আমি যেতে পারব।’

‘আচ্ছা যাও। ভয়ের কিছু নাই। আমি এখানে দাঁড়িয়ে থাকব।’

ভদ্রলোক রেল লাইনের উপর দাঁড়িয়ে রইলেন।

বাদামের টিন দেখে কুসুম আপুর কোনো ভাবান্তর হল না। বিরক্ত গলায় বলল, তুই নিয়ে যা। বাদাম আমি খাই না।

‘তোমাকে একটা চিঠিও দিয়েছে।’

‘চিঠি কেন আবার। পড়ে শোনা চিঠিতে কী লেখা।’

আমি চিঠি পড়ে শুনালাম।

জাপানি ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের চিঠিটায় লেখা—

কুসুম

Miss Flower,

ম্যাগাজিনগুলো খুঁজে পাচ্ছি না। পাওয়া মাত্র পাঠাব। তোমার সঙ্গে গল্প করে খুবই ভালো লেগেছে। আবারো একদিন গল্প করার জন্যে যাব। তবে কাজের প্রচন্ড ব্যস্ততা।

ইতি

কা. ইসলাম।

কুসুম আপু হাই তুলতে তুলতে বলল, একদিন গল্প করার জন্য আসবে লিখেছে? সে ইচ্ছা করলেই গল্প করতে পারবে? আমার ইচ্ছা করতে হবে না? কাঃ ইসলাম আবার কী? সরাসরি কাক ইসলাম লিখলেই হত। চেহারা তো কাকের মতোই।

‘তুমি রাগ করছ কেন?’

‘আমি রাগ করছি না। বিরক্ত হচ্ছি। দেখিস এই লোক খুবই বিরক্ত করবে। মাছি স্বভাবের কিছু মানুষ আছে যাদের প্রধান কাজ অন্যদের বিরক্ত করা। সারাক্ষণ ভ্যানভ্যান করবে। গায়ে বসতে চাইবে। এই ধরণের মানুষ আমার দুই চোখের বিষ।’

‘ও’

‘লিখেছে না কোনো একদিন গল্প করার জন্য আসবে? তুই দেখিস লোকটা গল্প করার জন্য আজ রাতেই আসবে।’

‘আজ রাতে আসবে না। কাল বিকালে আসতে পারে। চা খাবে আর ম্যাগাজিন দিয়ে যাবে।’

‘দেখিস আজ রাতেই আসবে। যদি আসে আর আমার খোঁজ করে তাহলে বলবি আমার জ্বর। মিথ্যা বলাও হবে না। আমার সত্যিই জ্বর।’

‘ও’

‘ও কিরে গাধা। কেউ যদি বলে আমার জ্বর তাহলে তার গায়ে হাত দিয়ে দেখতে হয় তার জ্বর কিনা। এটা ভদ্রতা।’

আমি গায়ে হাত দিয়ে দেখি কুসুম আপুর সত্যি সত্যি জ্বর। বেশ জ্বর। অথচ সে দিব্যি জ্বর নিয়েই চেয়ারে বসে পা দুলিয়ে দুলিয়ে লিখছে। কুসুম আপুর খুব সুন্দর বাঁধানো একটা খাতা আছে। এই খাতাটা খুব ছোট বেলায় তার বাবা তাকে দিয়েছিলেন। হঠাৎ হঠাৎ কুসুম আপু এই খাতা বের করে কী সব লেখে।

কুসুম আপুর বুকের বিশেষ চিহ্নটা যেমন আমার দেখতে ইচ্ছা করে। খাতাটাও পড়তে ইচ্ছা করে। বুকের চিহ্ন কোনো একদিন দেখলেও হয়তো দেখা যাবে। কিন্তু খাতা কোনোদিন পড়া যাবে না। এটা অসম্ভব ব্যাপার।

শ্রাবণ মাসের নিয়ম হল সারা দিন রোদ থাকবে রাতে শুরু হবে বৃষ্টি। এই বৃষ্টির নাম ঘুম বৃষ্টি। আব্দুর রহমান চাচার ধারণা আল্লাহ্ পাক চোরদের জন্যে

এই ঘুম বৃষ্টির ব্যবস্থা করেন। গৃহস্থ আল্লাহ্ পাককে যত ডাকে, চোররা ডাকে তার চেয়ে বেশি। আল্লাহ্ পাক যেহেতু রহমানুর রহিম, চোরদের কথাও তাঁকে শুনতে হয়। এই জন্যেই ঘুম বৃষ্টির ব্যবস্থা করে দেন। গৃহস্থ আরাম করে ঘুমায় আর চোর সব সাফা করে দেয়।

শ্রাবণ মাস এখনও শুরু হয় নি। আষাঢ় মাস যাচ্ছে কিন্তু ভাবটা শ্রাবণের। সন্ধ্যার পর থেকে বৃষ্টি। এই বৃষ্টির মধ্যে বাবা ইলিশ মাছ নিয়ে উপস্থিত হলেন। আমাদের অঞ্চলে ইলিশ মাছ পাওয়া যায় না। যারা ময়মনসিংহে যায় তারাই একটা দু'টা ইলিশ মাছ সঙ্গে নিয়ে আসে। হঠাৎ হঠাৎ তাদের কারোর কাছ থেকে বাবা মাছ যোগাড় করে ফেলেন। মাছ যোগাড়ের কাহিনী তিনি দীর্ঘদিন বলেন। সেই কাহিনী বলে তিনি বড়ই আনন্দ পান।

'বুঝলি টগর চারজন নামল ট্রেন থেকে। একজনেরও টিকেট নাই। আসছে ময়মনসিংহ থেকে, বলে আঠারোবাড়ি ইস্টিশনে উঠেছি। একটা ইস্টিশন পাড়ি দিছি। এর আবার টিকেট কী?' আমি বললাম, ইলিশ মাছ কিন্যা ফিরলা, মাছ পাইলা কই? আঠারোবাড়িতে ইলিশ মাছ পাওয়া যায়? রেলের নিয়ম আছে বিনা টিকেটের যাত্রির ভাড়া ধরা হবে যেখান থেকে ট্রেন যাত্রা শুরু করেছে সেখান থেকে। তাও সিঙ্গেল ভাড়া না, ডাবল ভাড়া। তোমরা বাহাদুরবাদ মেইলে আসছ। বাহাদুরবাদ মেইল যাত্রা করেছে চিটাগাং থেকে। সেইমতো ভাড়া দেও। চাইর জনে দুইশ পঁচিশ টাকা।'

তাদের তখন কান্দা কান্দা অবস্থা। তখন তাদের মধ্যে একজন বলল, মাষ্টার সাব কুড়িটা টেকা রাইখ্যা ছাইড়া দেন। আমি বললাম, অসম্ভব। জীবনে ঘুষ খাই নাই। খাবও না। সামান্য দুইটা টেকার জন্যে রোজ হাশরে পুলসিরাত পার হতে পারব না। শেষে তারা একটা মাছ দিয়া রফা করল। ঘুষ খাওয়া বিরাট পাপ। কিন্তু খাদ্য দ্রব্য হল রিজিক। রিজিকটা সরাসরি আল্লাহ্ পাকের কাছ থেকে আসে বলে খাদ্য দ্রব্য গ্রহণ করলে পাপ হয় না।'

ইলিশ মাছ ভাজা বাবার পছন্দ না। তাঁর পছন্দ সর্ষে ইলিশ। সরিষা আর কাঁচামরিচ মাখানো ইলিশের টুকরা কলাপাতায় মুড়ে ভাপ উঠা ভাতের হাড়ির মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে হবে।

ঘরে সরিষা ছিল না। রহিমা ফুপু আমাকে সরিষা আনতে পাঠালেন। সরিষা কিনে ফিরছি ভাগ্য খারাপ ধলা সামছুর সামনে পড়ে গেলাম। কতক্ষণে

ছাড়া পাব কে জানে। ধলা সামছু সরু গলায় বলল—যায় কেডা ইস্টিশন মাস্টার সাবের ছোট পুলাডা না?

আমি বললাম, হুঁ।

‘হাতে কী?’

‘সরিষা।’

‘সইন্ধ্যা রাইতে দোকানে তিনটা জিনিস বেচা হয় না, লবণ, সুই আর সরিষা। তোমারে বেচল কী ভাইব্যা?’

‘জানি না।’

‘তোমার দোষ নাই, আইজ কাইল অগা মগা বগা ছগারা ধানবেচা টেকায় নয়া দোকান দেয়। নিয়ম কানুন কিছুই জানে না। তুমি যে জিনিসটা খরিদ করলা তার জন্যে তোমার কোনো ক্ষতি হইব না। যে বেচল তার ক্ষতি। সমূহ ক্ষতি।’

‘ও আচ্ছা।’

‘তোমার একটা ভাই যে পরীক্ষা না দিয়া নিরুদ্দেশ হইছে তার খবর পাইছ?’

‘না।’

‘আসামে খুঁজ নেওন দরকার। পুরুষ নিরুদ্দেশ হইলে তারে পাওয়া যায় আসামে। আর নারী নিরুদ্দেশ হইলে তারে পাইবা বাজারে। বেশকম কি জান? আসামের পুরুষ ঘরে ফিরত আনা যায়। বাজারের নারী ঘরে আনন যায় না।’

‘চাচা আমি যাই।’

‘আইচ্ছা যাও। তুমি ইস্টিশনের ধারে থাক একটা জিনিস খিয়াল রাখবা—কোনো মেয়েছেলে রেল লাইনে গলা পাইত্যা বইস্যা আছে কিনা। তোমার চাচি অর্থাৎ আমার পরিবার এমন একটা ঘটনা ঘটাইতে পারে। সে আমারে কিছু বলে নাই—অন্য কয়েকজনকে বলেছে। তার মনে বেজায় দুঃখ। এর মধ্যে নিন্দালীশের পীর সাহেব ফতোয়া দিয়েছেন। এই বিষয়ে কিছু শুনেছ?’

‘জি না।’

‘তুমি পুলাপান মানুষ তোমার শোনার কথাও না। পীর সাহেব ফতোয়া দিয়েছেন—বাজারের মেয়েছেলের গলার স্বর যতদূর শোনা যাবে ততদূর পর্যন্ত ফিরেশতা আসবে না। ফিরিশতা না আসলে নামাজও কবুল হবে না। এই

মেয়েগুলোরে উঠাইবার ব্যবস্থা। এরা যাইব কই কও দেখি। একটা কুত্তার জন্যেও তো আমরার ঘরের চিপাত জায়গা আছে। এরা তো কুত্তা বিলাই না। আচ্ছা ঠিক আছে তুমি যাও—তুমি পুলাপান মানুষ। তোমারে আর কী বলব? কোনো মেয়েছেলে রেল লাইন ধইরা হাঁটাহাঁটি করে কিনা খিয়াল রাখবা। আমি নিজেও খিয়াল রাখি। রাইতের ঘুম অনেক দিন হইল বাদ দিছি।

কুসুম আপুর মধ্যে কি কোনো পীরিতি আছে? সে যা বলে তাই দেখি হয়। বলেছিল জাপানি ইঞ্জিনিয়ার রাতেই চলে আসবে। আসলেই তাই হয়েছে। সরিষা নিয়ে ফিরে দেখি ইঞ্জিনিয়ার সাহেব এসেছেন। বাবার সঙ্গে কথা বলছেন। তার রাতের বেলা আসার কারণ হল— তাঁবুর ভেতর সাপ ঢুকেছে। একটা না দু'টা। তিনি এসেছেন কার্বলিক এসিডের খোঁজে। বাবা বললেন, পল্লী অঞ্চলে এই সব জিনিস তো পাওয়া যায় না। আনাতে হয় ময়মনসিংহ থেকে। আমি আবদুর রহমানকে পাঠায়ে কাল দিনের মধ্যে আনায়ে দিব। আপনি আজ রাতটা এখানেই থাকেন। ইঞ্জিনিয়ার সাহেব বললেন, তার কোনো দরকার নেই। আমি এক কাপ চা খেয়ে চলে যাব। তাঁবুর ভেতর জ্বলন্ত হারিকেন থাকবে।

বাবা বললেন, অসম্ভব। এই ঝড় বৃষ্টির মধ্যে আপনাকে আমি ছাড়ব না। ইলিশ মাছ রান্না হচ্ছে। ইলিশ মাছ দিয়ে চারটা ভাত আমার সঙ্গে খেয়ে এই গরিব খানায় শুয়ে থাকবেন।

ইঞ্জিনিয়ার সাহেবকে দেখে মনে হল নিতান্ত অনিচ্ছায় তিনি রাজি হয়েছেন।

কুসুম আপু সব শুনে বলল, সাপ খোপ কিছু না। এখানে থাকবে এই বুদ্ধি করেই এসেছে।

আমি বললাম, বুঝলে কী করে।

কুসুম আপু ছোট নিঃশ্বাস ফেলে বলল, মেয়েরা এইসব জিনিস বুঝতে পারে। ব্যাটাছেলেরা পারে না। টগর শোন, গল্প করার জন্যে আমাকে যখন ডাকবে তুই বলে দিবি আমার জ্বর।

'আচ্ছা।'

'গায়ে হাত দিয়ে দেখ তো জ্বর কমেছে কিনা।'

আমি কুসুম আপুর কপালে হাত রাখলাম। জ্বর কমে নি, বরং অনেক বেড়েছে। শরীর দিয়ে ভাপ বেরুচ্ছে। অথচ কুসুম আপু কত স্বাভাবিক ভাবেই না কথা বলছে। আমার ধারণা ইচ্ছে করলে এই জ্বর নিয়েও কুসুম আপু জাপানি ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের সঙ্গে সারারাত গল্প করতে পারবে। হাসাহাসি করতে পারবে।

কুসুম আপুর জ্বর, তিনি বিছানায় শুয়ে আছেন আসতে পারবেন না এই খবর শুনে জাপানি ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের চোখ মুখ কেমন যেন হয়ে গেল। যেন তিনি বিরাট এক দুঃসংবাদ শুনেছেন। যেন চোখের সামনে মগরা ব্রিজের মাঝখানের স্প্যানটা পানির তোড়ে ভেসে গেছে। রেল লাইন শূন্যে ভাসছে। এদিকে সিগন্যাল ডাউন হয়েছে। ট্রেন আসছে।

'জ্বর খুব বেশি?'

'জি।'

'শুয়েছে কোথায়? চল তার ঘরে গিয়ে তাকে দেখে আসি।'

'কুসুম আপুর ঘরে যাওয়া যাবে না। উনার ঘরে গেলে উনি খুব রাগ করেন। কুসুম আপু ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে শুয়ে আছেন। এখন দরজা ধাক্কা দিলে চিৎকার করবেন।'

জাপানি ইঞ্জিনিয়ার মুখ কালো করে বললেন, তাহলে থাক।

বাবা ইস্টিশনে ঘুমুতে চলে গেলেন। ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের থাকার জায়গা গল ভাইয়ার ঘরে। উনি আমার দিকে তাকিয়ে বিস্মিত গলায় বললেন, তুমিও কি এই খাটে ঘুমাবে?'

আমি বললাম, জি।

উনি বললেন, আমার তো একটা প্রবলেম আছে। আমি কারো সঙ্গে বিছানা শেয়ার করতে পারি না। ভালো ঝামেলায় পড়লাম দেখি। আচ্ছা তুমি ঘুমাও— আমি রাতটা বারান্দার চেয়ারে বসে পার করে দেব।

আর তখনি মা খুব হইচই কান্নাকাটি শুরু করলেন। ইঞ্জিনিয়ার সাহেব চমকে উঠে বললেন, ব্যাপার কী কাঁদে কে?

আমি বললাম মা কাঁদছে। উনার মাথার যন্ত্রণা হলে এ রকম করেন।

উনি ভীত গলায় বললেন, আমার কাছে তো পাগলের প্রলাপ বলে মনে হচ্ছে। জিনিস পত্রও তো ভাঙ্গাভাঙ্গি হচ্ছে তোমার মা'র মাথা খারাপ নাকি?

আমি আহত গলায় বললাম, না।

উনি বললেন, এই বাড়িতে সিনিয়ার কেউ নেই? কুসুমের মা? উনাকে একটু ডাক আমি কথা বলি। মাই গড। আমার তো ধারণা আমি ভয়াবহ বিপদে পড়েছি। ডাক। কুসুমের মাকে ডাক।

আমি বললাম, রহিমা ফুপু বাইরের কোনো পুরুষ মানুষের সঙ্গে কথা বলেন না।

'ভালো যন্ত্রণায় পড়লাম তো। আচ্ছা ঠিক আছে তুমি ঘুমাও। আমি বারান্দায় আছি। তবে ঠিক নেই। আমি চলেও যেতে পারি।'

উনি একা বারান্দায় বসে রইলেন। ঝুম-ঝুম বৃষ্টি শুরু হল। আমি বিছানায় শুয়ে জেগে থাকার চেষ্টা করতে করতে এক সময় ঘুমিয়ে পড়লাম। ঘুম ভাঙ্গল খুব ভোরে। বৃষ্টি থেমে গেছে। ঘর আবছা আলো হয়ে আছে। এ-রকম সময় ঘুম ভাঙ্গাটা খুব আনন্দের। চোখ বন্ধ করলেই সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমিয়ে পড়া যায়। আমি ঘুমোতে পারলাম না। কারণ কুসুম আপুর গলা শোনা যাচ্ছে। আপু জাপানি ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে কথা বলছে। মনে হচ্ছে আপু কথা বলে খুব মজা পাচ্ছে।

'দু'টা সাপ দেখেই আপনি ভয় পেয়ে পালিয়ে এলেন। আপনি হচ্ছেন সর্প খাদক। আপনার উচিৎ ছিল সাপ দু'টি ধরে কেটে কুটে খেয়ে ফেলা। একটার ঝোল আর একটার দোপেয়াজা।'

'তুমি তো আশ্চর্য মেয়ে সাপ সাপ করেই যাচ্ছ। সাপ ছাড়া এই পৃথিবীতে কথা বলার আর বিষয় নেই।'

'আপনি কথা বলুন আমি শুনছি।'

'দেখি কাছে আসতো তোমার জ্বরের অবস্থাটা দেখি।'

'আধঘন্টার মধ্যে চারবার জ্বর দেখলেন। এর চে একটা কাজ করলে কেমন হয় আপনি সারাক্ষণ একটা হাত আমার কপালে দিয়ে রাখেন। হি হি হি।'

কুসুম আপু হেসেই যাচ্ছে। সেই হাসি থামছে না। আমি কুসুম আপুর হাসি শুনতে-শুনতে আবার ঘুমিয়ে পড়লাম।

রঞ্জু ভাইয়া এক সন্ধ্যায় চলে গিয়েছিল, আর এক সন্ধ্যায় ফিরল। সন্ধ্যাবেলায় চেনা মানুষকেই অচেনা লাগে, তাঁকে আরো অচেনা লাগছে। কেমন লোক-লোক দেখাচ্ছে। নাকের নিচে গোঁফ। গাল ভর্তি দাড়ি। মাথার চুলও অনেক বড় হয়েছে। তার চেহারাই যে লোক-লোক হয়েছে তা না, গা দিয়ে কেমন লোক-লোক গন্ধও বের হচ্ছে।

আমি দেখলাম অচেনা একজন মানুষের সঙ্গে যে ভাবে কথা বলা হয় বাবা তার সঙ্গে ঠিক সে ভাবেই কথা বলছেন। বাবার গলায় কোনো রাগ নেই। কোনো কৌতুহলও নেই।

'তারপর তুই ফিরলি কী মনে করে? আমি তো ভেবেছিলাম ফিরবি না। আছিস কেমন?'

'ভালো।'

'দাড়ি কি ইচ্ছা করে রেখেছিস নাকি কামানোর পয়সা নেই?'

ভাইয়া জবাব দিল না। দাড়ি চুলকাতে লাগলেন।

বাবা বললেন, দাড়িতে উকুন হয়েছে নাকি? টাকা নিয়ে যা, ক্ষৌরি করে আয়। এই চেহারা নিয়ে তোর মা'র সামনে যাবি না। ভয় পাবে। কয়েকদিন ধরে তার শরীরটা খারাপ করেছে। আর তোর পরিকল্পনাটা কী? এই খানেই থাকবি না ভূপর্যটনে বের হবি? ভূপর্যটক রমানাথ বিশ্বাস। সাইকেলে বিশ্ব ভ্রমন করেন।

ভাইয়া ঘাড় সোজা করে দাঁড়িয়ে রইল। বাবা স্টেশন মাস্টারের কোট গায়ে দিতে দিতে বললেন—তোর পড়াশোনা তো হবে না। চেষ্টা করেও লাভ নেই। একটা রিকশা কিনে দেই। সকাল সন্ধ্যা রিকশা টানবি। তোর শরীর তো ভালোই আছে। বাইরে-বাইরে ঘুরে আরো তাজা হয়ে এসেছিস। রোগা পটকা গরু যেমন ভাটি অঞ্চলের তাজা ঘাস খেয়ে মোটা হয়ে ফিরে। তোকে অবিকল সে রকম লাগছে। রিকশাটানার কাজ ভালো পারবি। কিংবা ইস্টিশনে কুলির কাজও করতে পারিস। বাবা ব্যাটা একই জায়গায় কাজ করব। খারাপ কী?

বাবার কোনো কথাই কানে যাচ্ছে না এমন ভঙ্গিতে ভাইয়া কলতলায় হাতমুখ ধুতে গেল। আমি ছুটে গেলাম কল চাপতে। ভাইয়াকে এত বেশি অচেনা লাগছে যে আমার খারাপ লাগছে। কাছাকাছি থেকে যদি অচেনা ভাবটা দূর করা যায়।

রঞ্জু ভাইয়া চোখে মুখে পানি দিতে দিতে বলল, ফিরার কোনো ইচ্ছা ছিল না। স্বপ্ন দেখে ফিরলাম। স্বপ্নটা না দেখলে ফিরতাম না।

'কী স্বপ্ন?'

'শাদা রঙের একটা হাতির পিঠে মা বসে আছে, গা ভর্তি গয়না। এই স্বপ্নের অর্থ ভালো না। গয়না পরে পালকিতে ওঠা, হাতি-ঘোড়ায় চড়া দেখা খুবই খারাপ।'

'ও।'

'কুসুম আছে কেমন?'

'ভালো।'

'কুসুমকেও একদিন স্বপ্নে দেখলাম। মাথার চুল লম্বা হয়ে পায়ের গোড়ালী পর্যন্ত গেছে। মেয়েদের চুল লম্বা দেখাও খারাপ আবার খাটো দেখাও খারাপ। মেয়েদের মাথা পুরোপুরি কামানো দেখা ভয়ংকর খারাপ। গয়না পরে হাতির পিঠে চড়ার মতো খারাপ। এই ধরণের স্বপ্ন দেখলে সদকা দিতে হয়।'

ভাইয়া কুসুম আপুর সঙ্গে কথা বলতে গেল। কুসুম আপু দরজা বন্ধ করে ঘুমুচ্ছিল। ইদানীং তার ঘুম খুব বেড়েছে। দুপুরে ঘুমুতে যায়—সন্ধ্যা পর্যন্ত ঘুমায়। তার সারারাত ঘুম হয় না বলে এই ঘুমটা নাকি খুব দরকার। কুসুম আপু দরজা খুলল, ভাইয়াকে দেখে একটুও চমকালো না। এমন ভাবে তাকাল যেন ভাইয়া এই বাড়িতেই ছিল। কোথাও নিরুদ্দেশ হয়ে যায় নি।

ভাইয়া বলল, আছিস কেমন?

কুসুম আপু বলল, ভালোই আছি। খারাপ থাকব কেন?

'তোর চুল দেখি আগের মতোই আছে। কাটার পর লম্বা হয় নি।'

'লম্বা হবার সুযোগ পায় না। একটু লম্বা হলেই ঘ্যাচ করে আবার কেটে ফেলি।'

'চুল লম্বা না হলেও তুই নিজে লম্বা হয়েছিস। এক ইঞ্চি লম্বা অবিশ্যিই হয়েছিস।'

কুসুম আপু হাই তুলতে তুলতে বলল, লম্বা হলে তো ভালোই।

ভাইয়া কুসুম আপুর খাটে বসতে বসতে বলল, দাড়ি রেখে ফেলেছি দেখছিস। দাড়ি রাখার হিস্টরিটা শোন—মুরাদনগরে এক পীর সাহেবের বাড়িতে ছিলাম। পীর সাহেবের দুই ছেলে। পীর সাহেবের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে দুইজন পীরাতি দাবি করে বসেছে। দাফন হয় নাই তারমধ্যে একে অন্যকে লাঠি নিয়ে মারতে যায় এমন অবস্থা। বিরাট দলাদলি। মুরিদানরাও দুই ভাগে ভাগ হয়ে গেছে। বেশির ভাগ মুরিদান নি-দাড়ি পীরের পক্ষে। নি-দাড়ি বুঝলি তো? দাড়ি নাই। পীর সাহেবের দুই ছেলের একজন মাকুন্দা তার নাম নি-দাড়ি পীর। অন্যজনের মুখ ভর্তি সিংহের মতো দাড়ি, সেই জন্যেই নাম দাড়ি পীর।

কুসুম আপু গল্প শুনে কোনো মজা পাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে না। একটু পর পর হাই তুলছে। গল্পের মাঝখানে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, যাই গোসল করব। বেশি ঘুমিয়েছি তো। শরীর আঠা-আঠা হয়ে আছে। এই আঠার নাম ঘুম-আঠা। ঘুম আঠায় গা ঘিন-ঘিন করে।

খুব মজার কোনো গল্পের মাঝখানে উঠে চলে যাওয়া কুসুম আপুর খুবই পুরানো অভ্যাস। ভাইয়া কুসুম আপুর এই অভ্যাসের সঙ্গে খুবই পরিচিত, তারপরেও ভাইয়া বেশ মন খারাপ করল। আমি বললাম, তারপর কী হয়েছে বল।

ভাইয়া হতাশ গলায় বলল, আরেক দিন বলব। টায়ার্ড লাগছে। তোদের খবর কী বল?

'খবর ভালো।'

'মা'র শরীর কি বেশি খারাপ নাকি!'

'উঁহুঁ বেশি খারাপ না।'

'সবাইকে চিনতে পারে?'

'হুঁ।'

'মা'র জন্যে মুরাদনগরের পীর সাহেবের তাবিজ নিয়ে এসেছি। আমাবস্যায় পরাতে হবে। পূর্নিমাতে খুলে ফেলতে হবে।'

'কোন পীর তাবিজ দিয়েছে? নি-দাড়ি পীর?'

'উঁহু আসল জন। উনার জিন সাধনা আছে। জিনের মাধ্যমে আনায়ে দিয়েছেন। শেষের দিকে আমাকে অত্যাধিক পেয়ার করতেন।'

‘উনার মৃত্যুর পর জিনগুলির কী হয়েছে?’

‘পাঁচটা জিন ছিল। সম্পত্তি ভাগের মতো জিন ভাগ করেছেন। দুই ছেলেকে দু’টা দু’টা করে দিয়েছেন। আর একটাকে আজাদ করে দিয়েছেন। সবচে যেটা ভালো ছিল তাকেই আজাদ করেছেন। তার নাম কফিল।’

‘তুমি জিন কফিলকে দেখেছ?’

‘দেখি নাই। তবে কথাবার্তা শুনেছি। খুবই ফ্যাসফ্যাসে গলা। সর্দি-সর্দি ভাব। বাংলায় কথা বলে তারপরও সব কথা বোঝা যায় না।’

‘মা’র তাবিজটা কে এনে দিয়েছে? কফিল?’

‘জানি না। বড় হুজুর শুধু বলেছেন, জিনের মাধ্যমে আনায়েছেন। এর বেশি কিছু বলেন নাই। বড় হুজুর কথাবার্তা খুবই কম বলতেন। তাঁর কথাবার্তা সবই ইশারায়। এক আঙুল তোলা মানে পানি খাবেন। দুই আঙুল তোলার অর্থ পান খাবেন। তিন আঙুল তুললে-তামাক। চার আঙুলে চা, পাঁচ আঙুলে খানা খাবেন। দুই হাতের দশ আঙুল তুললে বুঝতে হবে আজ দিনের মতো কাজকর্ম শেষ। তিনি মরতবায় বসবেন।’

‘মরতবা কি?’

‘ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করে সাধনা। জিন সাধনা কঠিন জিনিস। চল যাই মা’কে দেখে আসি।’

‘তুমি যাও। আমি যাব না।’

‘তুই যাবি না কেন?’

‘চিনতেটিনতে পারে না। খারাপ লাগে।’

‘মা সন্তানকে চিনতে পারে না, এটা একটা কথা হল। চিনতে ঠিকই পারে। মুখে বলে না।’

ভাইয়া আমাকে সঙ্গে নিয়ে মা’র ঘরে ঢুকলেন। দরজা জানালা সব বন্ধ বলে ঘর অন্ধকার। ঘরে কেমন ধোঁয়া ধোঁয়া গন্ধ। মনে হচ্ছে ভেজা খড় পুড়িয়ে ধোঁয়া দেওয়া হয়েছে। ধোঁয়া নেই—গন্ধটা আছে। মা শুয়ে ছিলেন, তিনি ধড়মড় করে উঠে বসতে-বসতে বললেন, কে?

ভাইয়া বলল, মা আমি রঞ্জু।

মা ক্ষীণ গলায় বললেন, টগরের বাবা ইস্টিশনে গেছেন। আপনে ইস্টিশনে যান।

ভাইয়া বললেন, মা চিনতে পারছ না। আমি রঞ্জু।

মা মাথার ঘোমটা দিতে দিতে বললেন, জি আমি চিনতে পেরেছি। আপনে বারান্দায় বসেন। আপনেরে চা দিব।

ভাইয়া ঘর থেকে বের হলেন। নিচু গলায় বললেন, পীর সাহেবের তাবিজটা দিলেই দেখবি সব ঠিক হয়ে গেছে। শুধু আমাবস্যা কবে এটা খুঁজে বের করতে হবে। লোকনাথ ডাইরেক্টরি পঞ্জিকা লাগবে। আর লাগবে একটা নতুন শাড়ি। নতুন শাড়ি পরায়ে তাবিজটা চুলের গোড়ায় বাঁধতে হবে। যন্ত্রণা আছে।

ভাইয়া দাড়ি গোঁফ কামাতে নাপিতের কাছে গেলেন। আমিও সাথে গেলাম। অনেক গল্প জমা আছে—এক এক করে সব গল্প শেষ করতে হবে। ভাইয়াকে দেখে আমার খুবই ভাল লাগছে। এত ভালো লাগবে কোনোদিন ভাবি নি।

ভাইয়া শুধু যে দাড়ি গোঁফ কামাল তা না। মাথাও কামিয়ে ফেলল। মাথা ভর্তি নাকি খুশকি। খুশকির একটাই চিকিৎসা মাথা কামিয়ে ফেলা। মাথা কামানোর সঙ্গে সঙ্গে ভাইয়ার শরীর থেকে লোক লোক ব্যাপারটা চলে গেল। তাকে এখন আর অচেনা লাগছে না। শুধু মনে হচ্ছে অনেক দিন খারাপ ধরণের জ্বরে ভুগেছিল। জ্বর সেরে শিং মাছের ঝোল দিয়ে পথ্য করছে।

মাথা কামিয়ে ভাইয়া আমাকে নিয়ে চা খেতে গেল। আগে চাই খেতে পারত না এখন তার নাকি রেস্টুরেন্টে চা খাওয়া অভ্যাস হয়ে গেছে। ঘরের চা খেতে পারে না। চায়ের অর্ডার দিয়ে গম্ভীর মুখে বলল,

‘তোর পড়াশোনার খবর কী রে?’

‘খবর ভালো।’

‘স্মৃতি শক্তি বাড়ানোর একটা দোয়াও শিখে এসেছি। পড়তে বাসার আগে তিনবার বলতে হয়—দোয়াটা কাগজে লিখে এনেছি। এখন থেকে এই দোয়া আমল করবি।’

‘আচ্ছা।’

‘আমি আর পড়াশোনা করব না সিদ্ধান্ত নিয়েছি। পড়াশোনা করলে আমিও এই দোয়া আমল করতাম।’

‘পড়াশোনা করবে না কেন?’

‘আমার পড়াশোনার বিষয়ে পীর সাহেব জিনের সাথে সোয়াল জওয়াব করেছেন। জিন বলেছে আমার কপালে লেখা পড়া নাই।’

‘এখন করবে কী?’

‘সার্ভিস করব। জিন বলেছে আমার কপালে ভালো সার্ভিস আছে।’

‘ঐ পীর সাহেবের বাড়িতে সব কিছুই জিনকে জিজ্ঞেস করে হয়?’

‘সব না গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি জিনকে জিজ্ঞেস করতে হয়। তবে জিন যে সব সময় সত্য কথা বলে তাও না। মিথ্যাও বলে। মানুষ যেমন মিথ্যা বলে জিনও বলে। অনেকের ধারণা ইবলিশ শয়তান ফেরেশতা। এটা সত্য না। পীর সাহেব বলেছেন—ইবলিশ শয়তান হল জিন।’

অনেকদিন পর রাতে ভাইয়ার সঙ্গে ঘুমুতে গেলাম। ভাইয়া সারারাতই গল্প করল। আমার কেন জানি মনে হল সে আসলে অপেক্ষা করছে কুসুম আপুর জন্যে। বাইরে খুট খাট কোনো শব্দ হলেই সে উঠে বসে। আগ্রহ নিয়ে দরজার দিকে তাকায়। কেউ যখন আসে না তখন বলে—টগর দেখত কুসুম দরজার বাইরে হাঁটাহাঁটি করছে নাকি? আমি দেখে আসি। দরজার বাইরে কেউ নেই শুনে ভাইয়া খুবই অবাক হয়। এমন ভাবে আমার দিকে তাকায় যেন আমার কথা ঠিক বিশ্বাস করতে পারছে না। ভাইয়ার মন ভালো করার জন্যে আমি পীর সাহেবের বাড়ির প্রসঙ্গ তুলি। ঐখানে খাওয়া দাওয়া কি করতে?

‘প্রথম দিকে খাওয়া দাওয়ার কষ্ট ছিল। শেষের দিকে হুজুরের সঙ্গে খানা পিনা করতাম। হুজুর কেবল মাছ খেতে পারতেন না। মাছের গন্ধ সহ্য হত না। বাড়িতে মাছ আনা ছিল নিষেধ। মাংসের মধ্যেও সব মাংস খেতেন না। মুরগি খেতেন না। মুরগি নারী জাতির মধ্যে পড়ে এই জন্যে। মোরগ খেতেন। কবুতরের মাংস খেতেন। আর তাঁর পছন্দের জিনিস হল – ‘বাইগুরি’।

‘বাইগুরিটা কী?’

‘চড়ুই পাখির মতো পাখি। এক সঙ্গে হুজুরে কেবলার জন্যে পঞ্চাশ ষাটটা রান্না হত। আস্ত পাখি অল্প আঁচে ঘিয়ে ভাজা। পাখিটা মনে হত মাখনের মতো মোলায়েম।’

‘তুমি বাইগুরি খেয়েছ!’

‘খাব না কেন? যে সব খাদ্য আল্লাহ্ পাক হালাল করেছেন। সে সব খাদ্য না খেলেও পাপ হয়।’

‘ও আচ্ছা।’

‘খাওয়া খাদ্য নিয়ে হুজুর কেবলার একটা গল্প আছে। আমার নিজের চোখে দেখা। গল্পটা শুনবি?’

‘হুঁ।’

‘কুসুম জেগে থাকলে তাকেও ডেকে নিয়ে আয়--। সেও মজা পাবে। এক গল্প তো তিন চারবার বলতে পারব না। একবারই বলব। যা ডেকে নিয়ে আয়। জেগে আছে কিনা কে জানে। রাত তো কম হয় নাই।’

কুসুম আপু জেগেই ছিল। গল্প শোনার জন্যে তাকে ডাকা হচ্ছে শুনে সে মুখ বাঁকিয়ে বলল, যা ভাগ। পীর সাহেবের বাড়ির জিন-পরীর গল্প শোনার আমার ঠেকা পড়েছে। মাথাছিলাকে ঘুমায়ে পড়তে বল।

আমি ফিরে এসে মিথ্যা করে বললাম, কুসুম আপু ঘুমায়ে পড়েছে।

ভাইয়া বিরক্ত গলায় বলল, তাহলে তুমি একাই শোন—নিজের চোখে দেখা ঘটনা। অতি চমকপ্রদ। ঘটনাটা হল এক লোক হুজুরে কেবলার জন্যে রান্না করা গোশত নিয়ে এসেছে। হুজুরে কেবলা এই গোশত না খেলে সে মনে কষ্ট পাবে। হুজুর বললেন, বাবা আমি তো মুরগির গোশত খাই না। মুরগি হল মাতা শ্রেণী।

সেই লোক বলল, মোরগের গোশত।

হুজুর বললেন, খাসি মোরগ না তো? খাসি মোরগও আমি খাই না। খাসি মোরগ হল শারীরিক খুঁত বিশিষ্ট প্রাণী।

লোক বলল, হুজুর পশ্চিমের কাবা ঘর সাক্ষী। খাসি মোরগ না।

হুজুর বললেন, আচ্ছা নিয়া আসো। গোশত আনা হল। হুজুরে কেবলা বুকের মাংস ছাড়া কিছু খান না। একটা পিস মুখে দিয়েই থু করে ফেলে দিয়ে বললেন—এটা মুরগির গোশত। মোরগ না। বাবা তুমি কেন আমার সঙ্গে মিথ্যাচার করেছ?

হুজুরে কেবলা কথা শেষ করেছেন আর তার সঙ্গে সঙ্গে তেলেসমাতি কান্ড। ঐ লোকের শুরু হল শূল বেদনা। কাটা মুরগির মতো ছটফট করে আর বলে—হুজুর আমারে মাফ দেন। আমার শইল জইল্যা যাইতাছে।

‘তার পরে?’

‘তার পর আর কি? হুজুর পানি পড়ে সেই পড়া পানি তাঁর গায়ে ছিটায়ে দিলেন। সে উঠে বসল। আশ্চার্য ঘটনা না?’

‘হুঁ আশ্চার্য।’

‘শেষের দিকে হুজুরে কেবলা আমাকে কি যে পেয়ার করতেন। কোনো মানুষের তাঁর শরীরে হাত দেয়ার নিয়ম ছিল না। শুধু আমি দিতাম। তাঁর ঘুমাবার আগে পিঠ মালিস করতাম। তারও অনেক কায়দা—শুধু আঙুল দিয়ে টিপতে হত। বেশি জোরেও না। আবার বেশি আস্তেও না। উনার পা টিপার অনুমতি পেয়েছিলাম শুধু আমি আর উনার বড় ছেলের ঘরের নাতনী। সালমা। মোসাম্মাত সালমা বানু। ঐ মেয়েরে দেখলে মাথা ঘুরে পড়ে যাবি। কী যে রূপ! পরীস্থানের পরীরও এত রূপ থাকে না।’

‘কুসুম আপুর চেয়েও সুন্দর?’

‘হুঁ। খবরদার কুসুমকে এটা বলিস না। মনে কষ্ট পাবে।’

‘বলব না।’

‘হুজুরে কেবলার মনে-মনে ইচ্ছা ছিল সালমার সঙ্গে আমার বিবাহ দিবেন। সরাসরি আমাকে কিছু বলেন নাই। আকারে ইঙ্গিতে বলেছেন।’

‘তোমার ইচ্ছা ছিল না। তাই না?’

‘বিবাহ কারো ইচ্ছা অনিচ্ছার উপর নির্ভর করে না। পাঁচটা জিনিস আল্লাহ্ পাক নিজের হাতে রেখে দিয়েছেন- হায়াত, মউত, রিজিক, ধনদৌলত আর বিবাহ। বিবাহটা আল্লাহর ইচ্ছার উপর। এখানে মানুষের ইচ্ছা বা মানুষের চেষ্টার কোনো দাম নাই। মানুষ নানান ভাবে নিজের পছন্দের মেয়ে বিবাহ করার চেষ্টা করে আর সাত আসমানের উপর বসে আল্লাহ্ পাক মুচকি হাসি হাসেন আর বলেন—মূর্খ মানব। তোমাদের তো বলে দিয়েছি বিবাহটা আমি আমার হাতে রেখে দিয়েছি। তারপরেও এত ফালাফালি করতেছ কেন?’

গল্প করতে করতে ফজরের আজান হল। জুম্মাঘর ইস্টিশন থেকে অনেক দূরে, কিন্তু আজান পরিষ্কার শোনা গেল। ভাইয়া বিছানা থেকে নামতে নামতে বলল, ফজরের নামাযটা পড়েই ফেলি। অনেক দিনের অভ্যাস। তুই ঘুমায়ে পড়।

আমি ঘুমুতে গেলাম না। ভাইয়ার সঙ্গে কল ঘরে গেলাম। ভাইয়া অজু করতে করতে বলল, ফজর ওয়াক্তে ঘুম থেকে উঠে নামায পড়ে কেউ যদি

বাইরে হাঁটাহাঁটি করে তাতেও সোয়াব আছে। এই সময় আল্লাহ্ পাক বেহেস্তের সব দরজা খুলে দেন। বেহেশতি হাওয়া শরীরে লাগে। একবার যাদের শরীরে বেহেশতি হাওয়া লাগে তাদের দোজখ নসিব হয় না।

ভাইয়া অজু করছে। আমি তার পাশে বসে শরীরে বেহেশতি হাওয়া লাগাচ্ছি। হাওয়াটা খুবই আরামদায়ক—ঠান্ডা-ঠান্ডা হাওয়া। শরীর সামান্য শির-শির করে।

আমি হঠাৎ করে বললাম, ভাইয়া কুসুম আপুর কোথায় বিয়ে এটা কি আল্লাহ্ নির্ধারণ করে রেখেছেন?

ভাইয়া বললেন, অবশ্যই। এই বিষয়ে মানুষের কোনোই হাত নেই। তুই তার চেয়ে বয়সে কত ছোট কিন্তু আল্লাহ্ পাকের আদেশ থাকলে তোর সঙ্গেও বিবাহ হতে পারে। রহিম বাদশা আর রূপবানের বিবাহ হয়েছিল না। রূপবান ছিল পূর্ণ যুবতী আর রহিম বাদশা দুধের শিশু। রূপবান রহিম বাদশাকে কোলে নিয়ে বেড়াত।

আমি বললাম, আবার জাপানি ইঞ্জিনিয়ারের সাথেও কুসুম আপুর বিয়ে হতে পারে তাই না? ভাইয়া হতভম্ব হয়ে বলল, জাপানি ইঞ্জিনিয়ার কে? আমি জবাব দিলাম না। অনেকক্ষণ থেকেই ভাইয়াকে চমকে দিতে ইচ্ছা করছিল। এখন চমকে দিলাম। ভাইয়া গম্ভীর গলায় আবার বলল, জাপানি ইঞ্জিনিয়ারটা কে?

রেলের খুব বড় অফিসার আসবেন। মেম্বার নাকি কী যেন বলে। মগরা ব্রিজ নিয়ে কী এক তদন্ত নাকি শুরু হয়েছে। বড় অফিসার সরজমিনে দেখবেন। জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। সকালে এসে সারাদিন থাকবেন, বিকেলে চলে যাবেন। দুপুরে খাওয়া দাওয়া করবেন। তবে খাওয়া দাওয়া নিয়ে ব্যতিব্যস্ত হবার কিছু নেই। তিনি সেলুনে করে আসবেন। সেই সেলুনে খাবার ঘর আছে। বাবুর্চি আছে। রান্নাবান্না বাবুর্চি করবে।

সেলুন আমি আগে কখনো দেখি নি। সেলুন দেখতে পাব সেই উত্তেজনায় আমার অস্থির লাগতে লাগল। যে সাজ-সাজ রব পড়েছে সেটা দেখতেও ভালো লাগছে। রহমান চাচার প্রধান কাজ হয়েছে—ইস্টিশনের চারিদিকের জংলা পরিষ্কার করা। রহমান চাচা লম্বা এক ধারাল বাঁকা দা নিয়ে জংলা সাফ করেন আর বিড় বিড় করে বলেন—"লাভ নাই। লাভ লোকসান কিছুই নাই।" আমি কাছে গেলে সরু চোখে বলেন, কাছে আসবা না দায়ের কাম করতাছি কাছে আসবা না। যারা দা কুড়ালের কাম করে তারার মাথা ঠিক থাকে না। এই দেখবা গাছ কাটতাছে এই দেখবা মাইনষের মাথা বরাবর কোপ।

রহমান চাচার কথাবার্তার এখন আর কোনোই ঠিক ঠিকানা নেই। মাথা মনে হয় পুরোপুরিই গেছে। বাবা বলে দিয়েছেন—রেলের সাহেব আসার আগে আগে রহমানকে দূরে কোথাও পাঠায়ে দিতে হবে। কখন কী বলে ফেলে তার নাই ঠিক।

বড় সাহেবের আগমন উপলক্ষে আমাদের বাড়ি ঘরও ঠিক ঠাক করা হচ্ছে। বাড়ির সামনের জংলা সাফ করানো হচ্ছে। বড় সাহেবদের মেজাজ মর্জি তো আগে ভাগে বোঝা যায় না। হঠাৎ হয়তো বলে বসলেন—ইস্টিশন মাস্টার সাহেব, চলুন দেখি আপনার কোয়ার্টার দেখে আসি। বাবা যখন বারহাট্টা স্টেশনের স্টেশন মাস্টার তখন একবার রেলের খুব বড় অফিসার এসেছিলেন। কথা বার্তা নেই হঠাৎ তিনি বললেন, স্টেশন মাস্টার সাহেব চলুন তো আপনি কোথায় থাকেন দেখে আসি। আর এক কাপ চাও খেয়ে আসি। আপনার বাড়িতে চায়ের ব্যবস্থা আছে না?

বাবা হাত কচলাতে কচলাতে বললেন, জি স্যার আছে।

সেই সময় আমাদের বাসায় চা খাবার চল ছিল না। চায়ের কাপ পিরিচ কিছুই নেই।

মানুষের জীবনে যেমন স্মরণীয় ঘটনা থাকে। বাবার জীবনে স্মরণীয় ঘটনা বুঝি এই একটাই। তিনি কতবার যে কতজনকে এই গল্প বলেছেন—"বুঝলেন ভাই সাহেব। মানুষ সাত হাত পানির নিচে যায়। আমি চলে গেলাম পঁচিশ হাত পানির নিচে। বড় সাহেবকে বলেছি চায়ের ব্যবস্থা আছে। উনি বাসায় চলে এসেছেন, সঙ্গে উনার পি. এ. চায়ের জন্যে অপেক্ষা করছেন। আমার ঘরে না আছে চা-চিনি-দুধ, না আছে চায়ের কাপ। আমি এক মনে দোয়া ইউনুস পড়তেছি আর আল্লাহ্ পাককে বলতেছি— আল্লাহ্ পাক আমাকে উদ্ধার কর। শেষে আল্লাহ্ পাক উদ্ধার করলেন। সেই দিন প্রথম বুঝলাম, এক দিলে আল্লাহর কাছে কিছু চাইলে আল্লাহ্ বান্দাকে সেই জিনিস দেন। এই দেখেন ঘটনা বলতে গিয়ে গায়ের লোম খাড়া হয়ে গেছে। দেখেন হাত দিয়ে দেখেন। ... ...।"

বৃহস্পতিবার সকাল দশটায় সেলুনে করে বড় সাহেব এলেন। সেলুনটা বাইরে থেকে তেমন কিছু না, রেলের কামরার মতো কামরা শুধু জানালায় পর্দা দেয়া। যে বড় সাহেব কামরা থেকে নামলেন, তাঁকে দেখে খুবই হতাশ হলাম। গাট্টাগোট্টা বেটে একজন মানুষ। মুখ ভর্তি পান। চক্রা বক্রা একটা হাফ সার্ট পরেছেন, সেই সার্ট ফুঁড়ে তার ভুড়ি বের হয়ে আসছে। মানুষ যখন হাটে তখনি শুধু তার ভুড়ি কাঁপে। এই ভদ্র লোকের ভুড়ি সারাক্ষণই কাঁপে। আমি তার ভুড়ির দিকেই তাকিয়ে রইলাম।

খুব যারা বড় সাহেব তারা কখনো রাগী হন না। রাগ হলেও এরা রাগ চেপে মুখ হাসি-হাসি করে রাখে। ইনি সেলুন থেকে নেমেই রাগারাগি হই-চই করতে লাগলেন। কার উপর রাগ করছেন সেটাও পরিষ্কার না। একবার মনে হচ্ছে তার সঙ্গে যারা এসেছেন তাদের উপর রাগ করছেন, আবার মনে হচ্ছে স্টেশনে তার সামনে যারা দাঁড়িয়ে আছেন তাদের উপর রাগ করছেন। কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। আমি রহমান চাচার পাশে দাঁড়িয়ে ছিলাম। রহমান চাচা গলা নামিয়ে ফিস ফিস করে বললেন, মদ খাইতে-খাইতে আইছে তো। মদ মাথাত উইঠ্যা এই সমস্যা। এখন কী করে কিছুই ঠিক নাই। গাঞ্জার নিশা এই জন্যই

সেরা নিশা। গাঁজা খাইয়া কেউ উল্টা পাল্টা কিছু করছে এইটা কোনোদিন শুনবা না।

আমি বললাম, মদ খেতে খেতে এসেছে কে বলল?

রহমান চাচা গলা আরো নামিয়ে বললেন, চেহারা দেইখ্যা বোঝা যায়। কালা মানুষ, লাল টুক-টুক ভাব ধরেছে দেখ না। আর সেলুন কারে কেউ আইব কিন্তু মদ খাইব না এই জিনিস আমি আমার জন্মে দেখি নাই। রেলে কাম করতেছি কম দিন হয় নাই। সেলুন কারের অনেক হিস্টোরি জানি। একবারের ঘটনা শোন—ছিঃ ছিঃ খুবই শরমের হিস্টোরি। থাউক আইজ না। আরেকটু শেয়ানা হও তখন বলব।

রহমান চাচাকে আজ অদ্ভুত দেখাচ্ছে। বড় সাহেব আসা উপলক্ষে চুল কাটিয়েছেন। ইস্ত্রী করা খাকি সার্ট প্যান্ট পরেছেন। নতুন এক জোড়া কাপড়ের জুতো কেনা হয়েছে। অন্য সময় কুঁজো হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতেন। আজ পাকা বেতের লাঠির মতো সোজা। বাবার ক্ষেত্রে ঘটেছে উল্টো ঘটনা। বাবা খানিকটা কুঁজো হয়ে গেছেন। বাঁ হাত সারাক্ষণ পেটের উপর দিয়ে রেখেছেন বলে তাঁকে খুবই অদ্ভুত দেখাচ্ছে। তিনি বাঁ হাত পেটের উপর দিয়ে রেখেছেন কেন তার কারণটা তখনো জানি না। তাঁর বিনয় প্রকাশের একটা অংশ হতে পারে। কিংবা কোটের একটা বোতাম হয়তো খুলে পড়ে গেছে। পেট ব্যথা করছে নাতো। কিছু দিন হল হঠাৎ-হঠাৎ বাবার প্রচন্ড পেট ব্যথা হচ্ছে। কে যেন বলেছে চায়ের চামচে দু’ চামচ কোরামিন খেলে পেট ব্যথা কমে। বাবা নিজে নিজে সেই চিকিৎসাও করছেন। আজকের ঘটনা কী? বড় সাহেব চলে যাবার পর বাবাকে জিজ্ঞেস করে জানতে হবে।

বড় সাহেবের বিকেলে যাবার কথা। তিনি দুপুর বারোটা পঁচিশ মিনিটে চলে গেলেন। মগরা ব্রিজের কাছে কিছুক্ষণ দাঁড়ালেন। জাপানি ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বললেন। তারপর ক্রেনের ড্রাইভার জামশেদকে কানে ধরে কুড়িবার উঠবোস করবার হুকুম দিলেন।

এই অংশটায় সবাই মজা পেল। সবচে মজা পেলেন বড় সাহেব নিজে। অনেক্ষণ পর তার মুখে হাসি দেখা গেল।

আঠারোবাড়ি স্টেশনের স্টেশন মাস্টার সাহেব বড় সাহেবের জন্যে কুড়িটা কই মাছ পাঠিয়েছিলেন। এই সময়ে এত বড় কই মাছ পাওয়ার কোনোই কারণ

নেই। তিনি কীভাবে যোগাড় করলেন কে জানে। বড় সাহেব যেহেতু চলে গেছেন কুড়িটা কই মাছ আমাদের বাসায় চলে গেছে। আমাকে পাঠানো হল জাপানি ইঞ্জিনিয়ার সাহেবকে দাওয়াত দিয়ে নিয়ে আসতে। দুপুরে যেন আমাদের সঙ্গে কই মাছের ঝোল খান। কুসুম আপু বলল, এই আমিও তোর সঙ্গে যাব। একটা ছাতি যোগাড় কর। রোদের মধ্যে হাঁটতে পারবো না। তুই আমার মাথার উপর ছাতি ধরে থাকবি।

'তোমার যাবার দরকার কী?'

'উনার সঙ্গে আমার গোপন কিছু কথা আছে।'

কুসুম আপুকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি। বৃষ্টি হচ্ছে না। আকাশ মেঘলা। তারপরেও আমি কুসুম আপুর মাথার উপর ছাতি ধরে আছি। পথ কাদা হয়ে আছে। আমি বললাম, রেল লাইনের স্লীপারের উপর পা দিয়ে দিয়ে হাঁটবে?

কুসুম আপু বলল, না। লম্বা-লম্বা পা ফেলা মেয়েদের জন্যে নিষেধ।

'কেন?'

'মেয়েদের অনেক ব্যাপার আছে। তুমি বুঝবি না। বাঁ দিকে তাকিয়ে দেখতো মাথা ছোলা ফেলকুমার বসে আছে কিনা।'

আমি বললাম, হুঁ।

'ফেলকুমার কি সিগারেট টানছে?'

'হুঁ।'

'খবরদার ওদিকে তাকাবি না। তাকালেই ডাকবে।'

'না তাকালেও ডাকবে।'

'ডাকুক খবরদার জবাব দিবি না। গট গট করে আমার পেছন পেছন হাঁটতে থাকবি।'

'আচ্ছা।'

ভাইয়ার দিকে আমি তাকাচ্ছি না, কিন্তু বুঝতে পারছি ভাইয়া অবাক হয়ে আমাদের দেখছে। এতই অবাক হয়েছে যে সিগারেট টানতে ভুলে গেছে। সিগারেট গেছে নিবে। রহমান চাচার কথা অনুসারে বাইস্যা মাসে সিগারেট হয়ে যায় বিড়ির মতো। একটা টান সামান্য দেরি করে দিলেই সিগারেট যায় নিবে। আমাদের দেখার পর ভাইয়া নিশ্চয়ই সময়মতো সিগারেট টান দেবে না। দেরি হবেই।

'টগর তোরা কই যাচ্ছিস?'

আমি না শোনার ভান করলাম।

'এই টগর এই।'

আমি কুসুম আপুর অন্য পাশে চলে এলাম। ভাইয়া সাইকেলের ঘন্টা বাজাচ্ছে। কুসুম আপু বলল, খবরদার পেছনে তাকাবি না। পেছনে তাকালে খেজুর কাঁটা দিয়ে চোখ গেলে দেব।

'ভাইয়া সাইকেল নিয়ে চলে আসছে।'

'আসুক আসলে দেখা যাবে। কথা যা বলার আমি বলব। তুই চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকবি।'

ভাইয়া ঝড়ের গতিতে সাইকেল নিয়ে উপস্থিত হল। তার মুখ রাগে থমথম করছে। তাকে ভয়ংকর দেখাচ্ছে। ভাইয়া কুসুম আপুর দিকে তাকিয়ে বলল, কুসুম যাচ্ছ কোথায়?

কুসুম আপু অবহেলার ভঙ্গিতে বলল, মগরা ব্রিজে।

'ঐখানে কী?'

'ঝপাং খেলা খেলব। দু'টার সময় চিটাগাং মেইল আসবে। তখন ঝাঁপ দিব।'

'পাগল নাকি?'

'পাগল হব কী জন্যে। তুমি ঝপাং খেলা খেলতে পার আমি পারি না। আমিও পারি।'

'এইসব মেয়েদের খেলা না।'

'ছেলেরা যেসব খেলা খেলতে পারে। মেয়েরাও পারে। তবে কিছু-কিছু খেলা শুধু মেয়েরা খেলতে পারে। ছেলেরা পারে না।'

'কুসুম বাসায় চল।'

'না।'

'না মানে? তোকে চুল ধরে টেনে নিয়ে যাব। এই টগর আমার সাইকেলটা ধরতো।'

কুসুম আপু হতাশ ভঙ্গিতে বলল, ঝপাং খেলা খেলতে যাচ্ছি না। ইঞ্জিনিয়ার সাহেব আমাকে আর টগরকে কফি খাবার নিমন্ত্রণ করেছেন। কফি খেতে যাচ্ছি।

‘কফি খাবার দাওয়াত করল কেন?’

‘সুন্দর মেয়ে দেখলে ছেলেদের মাথা ঠিক থাকে না। সুন্দরী মেয়েদের গায়ের বাতাস খাবার জন্যে ছেলেরা করে না এমন জিনিস নাই। তুমি পেছনে-পেছনে আসছ কেন? তোমাকে তো আর কফি খেতে বলে নি।’

ভাইয়া সাইকেল হাতে দাঁড়িয়ে পড়ল। আমরা এগিয়ে গেলাম।

জাপানি ইঞ্জিনিয়ার আমাদের দেখে কী করবেন তাই যেন বুঝতে পারছেন না। প্রতিটা কথা দু'বার তিনবার করে বলছেন। অকারণে হাসছেন। দেখার মতো দৃশ্য।

‘কুসুম তুমি আসবে চিন্তাই করি নি। ইশ তোমার শাড়িটা কাদায় মাখামাখি হয়ে গেছে। শাড়িটা ধুয়ে নেবে? দাঁড়াও পানি দিচ্ছি। গুঁড়া সাবান আছে। গুঁড়া সাবান ছিটিয়ে দাও।’

কুসুম আপু বলল, আপনাদের বড় সাহেব এসে কী বলল?

‘আর উনার কথা বলবে না। হাফ মেড একটা মানুষ। অকারণে চিৎকার চেঁচামেচি। একে শাস্তি। ওকে শাস্তি।’

‘আপনাকেও নাকি শাস্তি দিয়েছে?’

জাপানি ইঞ্জিনিয়ার হতভম্ব গলায় বললেন, এইসব তুমি কী বলছ। আমাকে শাস্তি দেবে কেন?

কুসুম আপু নিচু গলায় বলল, চারিদিকে এরকম রটনা। আপনাকে নাকি, আপনাকে নাকি.... ... .

‘আমাকে নাকি কী?’

‘আপনাকে নাকি পঁচিশবার কানে ধরে উঠ বোস করিয়েছেন।’

‘চারিদিকে এই রটনা?’

‘জি। সেই জন্যেই আপনাকে দেখতে এসেছি। আমি টগরকে বললাম, উনি নিশ্চয়ই খুব মন খারাপ করেছেন। চল উনাকে সান্ত্বনা দিয়ে আসি।’

‘খুবই ভুল কথা শুনেছ। কথাটা যে তোমরা বিশ্বাস করেছ সেটা ভেবেই আমি অবাক হচ্ছি। উনি শাস্তি দিয়েছেন জমশেদকে। ক্রেনের ড্রাইভার। সে ক্রেনে বসে ছিল। সেখান থেকে পানের পিক ফেলেছে। পিক পড়েছে বড় সাহেবের প্যান্টে। তখন তিনি এই শাস্তি দিয়েছেন।’

অন্যদিন জায়গাটা লোকজনে গমগম করত। আজ পুরোপুরি ফাঁকা। মনে হচ্ছে জাপানি ইঞ্জিনিয়ার ছাড়া আর কেউ নেই। চটের বস্তা পানিতে ফেলার জন্যে বিশ পঁচিশ জন কুলি সব সময় থাকতো। আজ তারাও নেই। কুসুম আপু বলল, আপনার লোকজন সব কোথায়?

জাপানি ইঞ্জিনিয়ার চোখ মুখ কুঁচকে বললেন, বিরাট ঝামেলা হয়ে গেছে। বড় সাহেব চলে যাবার পরই জমশেদ বলল, সে চাকরি করবে না। ব্যাগ গুছিয়ে রওয়ানা। তার অপমানের বিচার যদি হয় তাহলেই সে চাকরিতে জয়েন করবে। বিচার না হলে – না। এরা হল লিডার টাইপ লোক। তার দেখাদেখি ফোরম্যান ব্যাগ গুছিয়ে ফেলল। ফোরম্যানের সঙ্গে তিন এসিস্টেন্ট। কাজেই আমি কাজ বন্ধ করে কুলিদের ছুটি দিয়ে দিলাম।

'ব্রিজের কাজ বন্ধ?'

'এ ছাড়া উপায় কী? বড় সাহেব যে ভেজাল লাগিয়েছে এই ভাজাল কবে মিটবে কে জানে। সরকারি ব্যাপার তো তদন্ত কমিটি বসবে। মিটিং হবে। ফাইল চালাচালি হবে। সরজমিনে তদন্ত করার জন্যে সেলুন কারে করে রেলওয়ে বোর্ডের মেম্বাররা আসবেন। তদন্ত রিপোর্ট বের না হওয়া পর্যন্ত সব কাজ থাকবে বন্ধ। এবং একদিন ঝুপ করে পুরো ব্রিজ নদীতে পড়ে যাবে। ব্রিজ কেন পড়ল সেই নিয়ে আবার তদন্ত কমিটি বসবে। আবার মিটিং। আবার ফাইল চালাচালি।'

'আপনার তো মজাই হল—কাজ নেই।'

'কাজ থাকাটাই হল মজার। কাজ না থাকা কোনো মজার ব্যাপার না। কাজ করা মানুষকে একদিন কাজ ছাড়া বসিয়ে রাখ তার মাথা নষ্ট হয়ে যাবে।'

'আপনার মাথা কি নষ্ট হয়ে গেছে?'

'এখনো যায় নি। তবে যাবে। আজ দুপুরে খাব কী সেটা পর্যন্ত ঠিক নেই। বাবুর্চিও চলে গেছে।'

কুসুম আপু বলল, আজ দুপুরে আমাদের সঙ্গে খাবেন। আপনার কই মাছ খাওয়ার দাওয়াত। আমরা আপনাকে নিতে এসেছি।

জাপানি ইঞ্জিনিয়ার হাসি মুখে বললেন, তোমরা নিতে না এলেও আমি তোমাদের বাসায় চলে যেতাম। অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে আমাকে মনে হয় ঘন-ঘন

তোমাদের ওখানেই খেতে হবে। তোমরা একটু দাঁড়াও আমি কাপড়টা বদলে আসি। কুসুম তাঁবুর ভেতর কেমন দেখা যায় তুমি দেখতে চাও?

কুসুম আপু বলল, আর একদিন দেখব। আজ না।

'আজ না দেখাই ভালো। খুবই এলোমেলো হয়ে আছে। গুছিয়ে রেখে তোমাকে খবর দেব।'

ইঞ্জিনিয়ার সাহেব তাঁবুর ভেতর ঢুকে গেলেন। আর তখনি চিটাগাং মেইলের হুইসেল শোনা গেল। কুসুম আপু হুইসেল শুনে হঠাৎ খুবই চমকে গেল। তার মুখ চোখ অন্য রকম হয়ে গেল। কুসুম আপু গলা নামিয়ে বলল, টগর শোন, আমার ঝপাং খেলা খেলতে ইচ্ছে করছে। আমি মগরা ব্রিজে উঠছি। খবর্দার ভয় পাবি না।

ঠিক সময়ে আমি পানিতে ঝাঁপ দেব।

আমার হাত পা ঠান্ডা হয়ে গেল। কুসুম আপুর সঙ্গে এখন কোনো রকম তর্ক করা বৃথা। তাকে দু'হাতে ঝাপটে ধরে রাখার চেষ্টা করা যায়। তাতে লাভ হবে না। একা আমি তাকে আটকাতে পারবো না। জাপানি ইঞ্জিনিয়ার পারবেন। আমি ছুটি গেলাম তাঁবুর দিকে।

কুসুম আপু হেলতে দুলতে ব্রিজের উপরে রেলের স্লীপারে পা রেখে হাঁটছে। বাতাসে তার শাড়ির আঁচল উড়ছে। মাথার চুল উড়ছে। তার মুখ হাসি-হাসি। বাঁকের আড়াল থেকে ট্রেন বের হয়ে এসেছে। ট্রেনের ড্রাইভার এখনো দেখতে পায় নি যে ব্রিজের উপর একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দেখতে পেলে ক্রমাগত হুইসেল দিত।

জাপানি ইঞ্জিনিয়ার প্রথমে কিছুক্ষণ বুঝতেই পারলেন না যে কুসুম আপু ব্রিজের উপর। হঠাৎ বুঝতে পেরে হতভম্ব গলায় বললেন, কুসুম তুমি কী করছ?

কুসুম আপু চেঁচিয়ে বলল, কিছু করছি না। হাঁটছি।

'দৌড়ে চলে এসো। দৌড়ে আস।'

'না।'

'তোমার কি মাথা খারাপ নাকি। এই কুসুম এই।'

কুসুম আপু শব্দ করে হাসল। এখন সে আর রেল স্লিপারে পা দিয়ে হাঁটছে না। এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। ইঞ্জিনিয়ার সাহেব আমার দিকে তাকিয়ে কাঁদো কাঁদো গলায় বললেন—মেয়েটি পাগল? Insane?

ট্রেনের ড্রাইভার এখন কুসুম আপুকে দেখতে পেয়েছে। ক্রমাগত হুইসেল বাজিয়ে যাচ্ছে। হুইসেলের সঙ্গে টুনটুন করে ঘন্টাও বাজছে।

ইঞ্জিনিয়ার সাহেব ভাঙ্গা গলায় ডাকলেন এই—কুসুমক! এই!

কুসুম আপু বলল, আপনি এসে আমাকে নিয়ে যান।

আমি এতক্ষণ খুব ভয় পাচ্ছিলাম। কুসুম আপু দাঁড়িয়ে পড়ার পর আর ভয় পাচ্ছি না। কারণ কুসুম আপু খুব হিসেব করে দাঁড়িয়েছে। দু'টা স্প্যানের ঠিক মাঝখানে। এখান থেকেই নদীতে ঝাঁপ দেয়া নিরাপদ। আপু বার বার নদীর দিকে তাকাচ্ছে এর অর্থ হল—ঝাঁপ দেবার আগে হিসেব করে নেয়া। দুই হাত উঁচু করে রাখার কারণও একটাই। ঝাঁপ দেবার আগে দু'হাত উঁচু করতে হয়।

ট্রেন ব্রিজের উপর উঠে পড়েছে। কুসুম আপুর আর দেরি করা উচিৎ না। কেন দেরি করছে। ঝপাং খেলার নিয়ম হচ্ছে ট্রেনের ইঞ্জিনের দিকে কখনো না তাকানো। ইঞ্জিনের দিকে চোখ পড়লেই নাকি হাত পা শক্ত হয়ে যায়। কুসুম আপু তাকিয়ে আছে ইঞ্জিনের দিকেই।

এক সময় ইঞ্জিন কুসুম আপুকে আড়াল করে ফেলল, তারপর ব্রিজ পার হয়ে গেল। আমি মগরা নদীর দিকে তাকিয়ে আছি। কুসুম আপুকে দেখতে পাচ্ছি—সাঁতার কেটে তীরের দিকে আসার চেষ্টা করছে। নদীতে প্রবল স্রোত। তার যে বেশ কষ্ট হচ্ছে তা দেখে বোঝা যাচ্ছে।

বাবা চোখ বড়বড় করে তাকিয়ে আছেন। যেন ভাইয়াকে চিনতে পারছেন না। তার চেহারা চেনা চেনা লাগছে। কোথায় দেখেছেন মনে করতে না পারায় একটু যেন বিব্রত।

ভাইয়াকে অবশ্যি খুবই চেনা লাগছে। মাথায় বারান্দা দেয়া টুপি পরায় ভালো দেখাচ্ছে। ছোলা মাথা ঢাকা পড়েছে। গায়ের খাকি পোশাকটাও খুব মানিয়েছে। সবচে মানিয়েছে পায়ের লাল রঙের কাপড়ের জুতো। খাকি পোশাক পরার জন্যেই হয়তো ভাইয়া অতিরিক্ত গম্ভীর হয়ে আছে। কারো চোখের দিকে সরাসরি তাকাচ্ছে না। খাকি পোশাক পরা মানুষ কারোর চোখের দিকেই সরাসরি তাকায় না। দুই ভুরুর মাঝখানে তাকায়। এটা আমার কথা না, রহমান চাচার কথা। তিনি যৌবনে আনসার বাহিনীতে ঢুকেছিলেন। সেখানেই নাকি তাকে শেখানো হয়েছে দুষ্ট লোকজনদের চোখে চোখে না তাকিয়ে দুই ভুরুর মাঝখানে তাকাতে।

বাবা চাপা গলায় বললেন—ব্যাপার কী সং সেজেছিস কেন?

ভাইয়া বলল, সার্ভিস পেয়েছি।

বাবা বললেন, কোন বেকুব তোকে চাকরি দিল?

‘এনজিওর চাকরি।’

‘চাকরিটা কী?’

‘গ্রামের বিভিন্ন বাড়িতে স্যানিটারি পায়খানা ফিটিং হবে। তার তদারকি। এ ছাড়াও আরো ডিউটি আছে।’

বাবা ছোট্ট করে নিঃশ্বাস ফেললেন। হতাশ গলায় বললেন, শেষ পর্যন্ত পাইখানার মিস্ত্রি? আমার কোনো অসুবিধা নাই। অসুবিধা হবে তোর।

ভাইয়া গম্ভীর গলায় বলল, কী অসুবিধা?

‘তোর বিয়ে শাদি হবে না। পাত্রী পক্ষের কাছে খবর যাবে জামাই গু ইঞ্জিনিয়ার। গু ইঞ্জিনিয়ারকে বিয়ে করতে কোনো মেয়ে রাজি হবে না। মেয়েদের মধ্যে শুচিবায়ু বেশি থাকে।’

‘আমার বিয়ে নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না।’

‘চাকরি যেমন যোগাড় করেছিস, বিয়েরও ব্যবস্থা হয়েছে? আলহামদুলিল্লাহ। দু’টা বড় খবর শুধু মুখে দিলি। মিষ্টি কিনে আন। বাতাসা কিনে আন। সবাইকে একটা করে বাতাসা দিবি আর এক ঢোক পানি। গু চাকরিতে এরচে বেশি কিছু খাওয়ানো ঠিক না। লোক হাসবে।’

ভাইয়া বাবার সামনে থেকে চলে গেল।

বাবা নিজের মনে বিড় বিড় করতে লাগলেন—কত রকম কারিগরের কথা শুনেছি—ঘরের কারিগর, জিলাপির কারিগর, আজ শুনলাম গুয়ের কারিগরের কথা। সেই কারিগর আমার ঘরে বসে আছে। আহা কী আনন্দ। কেউ যদি জিজ্ঞেস করে আপনার বড় ছেলে কী করে? আমি বুক ফুলিয়ে বলতে পারব, সে গু-কারিগর। তার সব বাণিজ্য গু নিয়ে।

বাবা আজকাল খুব বেশি কথা বলছেন। একবার কথা বলতে শুরু করলে আর থামেন না। কথা বলেই যান। বলেই যান। একই কথা নানান ভঙ্গিতে বলেন। শেষের দিকে শুনতে খুবই বিরক্তি লাগে। কেরোসিন চিকিৎসার সঙ্গে এর মনে হয় কোনো যোগ আছে। পেটের ব্যথার জন্যে কেরোসিন খাওয়া শুরুর পর থেকেই বাবার কথা বলা বেড়েছে।

আমি হাতের লেখা লিখছিলাম। বাবা আমার দিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে ধমকের ভঙ্গিতে বললেন, চট করে একটা অংক কর। একটা গ্রামে তিনশ লোকের বাস। এরা প্রত্যেকে যদি গড়ে দৈনিক ৫০০ গ্রাম করে পায়খানা করে তাহলে এক মাসে গ্রামে গু এর পরিমাণ কত হবে? ঐকিক নিয়মে কর।

আমি বললাম, এই অংক করতে হবে কেন?

‘তোর ভাইতো আর অংক করতে পারবে না। গু-এর অংক সব তোর করতে হবে।’

‘এই অংক আমি করব না।’

‘আচ্ছা যা করিস না।’

আমি বাবার সামনে থেকে উঠে চলে এলাম। বাবা নিজের মনে বিড়বিড় করতে লাগলেন। বিড়বিড় করে কী বলছেন বারান্দা থেকে শুনতে পাচ্ছি না। নিশ্চয়ই গু বিষয়ক কিছুই হবে।

বাবার কি শরীরের তাল নষ্ট হয়ে গেছে? একটা বয়সের পর মানুষের শরীরের তাল নষ্ট হয়ে যায়। সেই বয়সটা একেক জনের জন্যে একেক রকম।

এটা আমার কথা না। জাপানি ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের কথা। জ্ঞানী-জ্ঞানী কথা তিনি আগে বলতেন না। আজকাল বলেন। তিনি এখন ঘরের মানুষ হয়ে গেছেন। ঘরের মানুষ অনেক কিছু বলতে পারে। জ্ঞানের কথা তো বলতেই পারেই। তিনি যে শুধু জ্ঞানের কথা বলেন তা না, প্রাইভেট টিচারের মতো আমার পড়া ধরেন। আবার ধাঁধা জিজ্ঞেস করেন। জটিল সব ইংরেজি ধাঁধা। ঠোঁট গোল করে বলেন—বল দেখি টগর—নয় কেন সাতকে ভয় পায়? চট করে বল Why nine is afraid of seven. নয় তো সাতের চেয়ে বড় নয়ের তো সাতকে ভয় পাবার কথা না। দেখি তোমার বুদ্ধি কেমন চট করে বল।

এ ধরণের ধাঁধা তিনি তখনি জিজ্ঞেস করেন যখন কুসুম আপু আশেপাশে থেকে। জাপানি ইঞ্জিনিয়ারের লক্ষ্য আমি না, কুসুম আপু। কাজেই আমি ধাঁধা নিয়ে মোটেই মাথা ঘামাই না। জাপানি ইঞ্জিনিয়ার খুবই হতাশ হয়ে বলেন, এ কী পারছ না কেন? চেষ্টা করে দেখ। আচ্ছা কুসুম তুমি বল।

কুসুম আপু হাই তুলতে তুলতে বলল—নয় সাতকে ভয় পায় কারণ নয় খুব ভীতু প্রকৃতির। আপনার মতো।

'আমি ভীতু?'

'অবশ্যই ভীতু ঐ দিন ব্রিজের উপর দাঁড়িয়ে আপনাকে ডাকলাম। বললাম, আমাকে হাত ধরে নিয়ে যান। আপনি এসেছিলেন?'

'আমি যদি ঐ দিন তোমাকে আনতে যেতাম তাহলে আমিও মারা পড়তাম। তুমিও মারা পড়তে।'

'মারা পড়লে পড়তাম। মরার আগে জেনে যেতাম আপনি খুব সাহসী একজন মানুষ। আপনার সম্পর্কে আমার একটা ভালো ধারণা হত।'

'এখন কি আমার সম্পর্কে খারাপ ধারণা?'

'হ্যাঁ।'

'আচ্ছা ঠিক আছে খারাপ ধারণা থাকলে খারাপ ধারণা, এখন ধাঁধার জবাব দাও—Why nine is afraid of seven?

'জানি না।'

Because Seven eight nine.

'তার মানে?'

‘তার মানে eight বানানটা ate কর। Seven ate nine. এখন বুঝতে পারছ। সাত নয়কে খেয়ে ফেলল।

‘Very funny তাই না?’

কুসুম আপু মুখ গম্ভীর করে বলল—আপনি শুধু যে ভীতু তাই না, আপনি খানিকটা বোকাও।

‘বোকা কেন?’

‘বোকারাই এই জাতীয় ধাঁধা বলে খুব মজা পায়।’

‘ও’

কুসুম আপু প্রতিদিনই জাপানি ইঞ্জিনিয়ার সাহেবকে কঠিন-কঠিন কিছু কথা বলেন। আগে এই সব কথায় ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের মুখ কালো হয়ে যেত। এখন হয় না। তিনি কুসুম আপুর কঠিন কথাগুলি সহজ ভাবেই নেন। বাইরের কেউ হলে তিনি কথাগুলি সহজভাবে নিতেন না। এখন তিনি ঘরের মানুষ।

তিনি নাকি ইঙ্গিতে জানিয়েছেন কুসুম আপুকে তার খুবই পছন্দ। তার প্ল্যান আরো ছ’বছর পর বিয়ে করা। কারণ ছ’বছর পর রেলের কোয়ার্টার পাবেন। তবে কথাবার্তা এখনই পাকা করে রাখা যেতে পারে। রেলের এই চাকরি তার পছন্দ না। তিনি দেশের বাইরে চলে যাবার চেষ্টা করছেন। নানান জায়গায় লেখালেখি করছেন। কোনো একটা যদি লেগে যায় তাহলে কিছুটা আগেই হবে।

কুসুম আপু তার উত্তরে কি বলেছেন তা জানা যায় নি। আমার ধারণা তিনি শরীর দুলিয়ে খুব হেসেছেন। যে হাসির দু’রকম অর্থ করা যায়—প্রথম অর্থ—“আমি খুব খুশি” এবং দ্বিতীয় অর্থ—“এইসব কী হাস্যকর কথা। আমি কোন দুঃখে আপনার মতো বোকাকে বিয়ে করব।”

জাপানি ইঞ্জিনিয়ার ভদ্রলোক এখন দু’বেলাই আমাদের এখানে খান। দুপুরে টিফিন কেরিয়ারে করে সাইটে তার জন্যে খাবার যায়। রাতে তিনি নিজেই খেতে আসেন। খাওয়া দাওয়ার পর বেশির ভাগ সময়ই রাতে থেকে যান।

ভাইয়া রাতে বাসায় থাকেন না, তার বন্ধু আজীজের বাসায় ঘুমুতে যান। জাপানি ইঞ্জিনিয়ার আমাকে পাশে নিয়ে ঘুমান। আমাদের দু’জনের মাঝখানে তিনি একটা বালিশ দিয়ে রাখেন। গায়ের সঙ্গে গা লাগলে তার নাকি ঘুম হয়

না। ভদ্রলোকের ঘুম এমনিতেও কম। প্রায়ই আমি ঘুম ভেঙ্গে দেখি ভদ্রলোক জেগে বসে আছেন। সিগারেট খাচ্ছেন। আমাকে হঠাৎ জেগে উঠতে দেখলে স্বস্থি পান। তখন বেশ আগ্রহ নিয়ে গল্প করেন। বেশির ভাগই ভুত-প্রেতের গল্প।

'তোমাদের বাড়িতে কি ভূতের উপদ্রপ আছে নাকি?'

'নাহ্।'

'আমার তো মনে হয় আছে। মাথার কাছের জানালাটা হঠাৎ দেখলাম আপনা আপনি বন্ধ হল। আবার খুলেও গেল। কোনো বাতাসটাতাস কিছু ছিল না। আচ্ছা ধরলাম বাতাসে বন্ধ হয়েছে। তাহলে খুলল কীভাবে? জানালা খুলতে হলে ঘরের ভেতর থেকে বাতাস বাইরে যেতে হবে। তাই না?'

'জি'

'ব্যাপারটা আমি আগেও লক্ষ করেছি। অন্য কোনো জানালা না, মাথার কাছের এই জানালাটাতেই শুধু এই ঘটনাটা ঘটে। খুব পুরানো বাড়িতে জিন ভূত থাকে, আবার ধর নতুন বাড়িতেও থাকে। ধর তুমি একটা বাড়ি বানালে। বাস করার জন্য প্রথম সেই বাড়িতে উঠলে। তখন অবিশ্যিই বিচিত্র সব জিনিস দেখবে।'

'ও'

'আমার ছোট মামা সিরাজগঞ্জে একটা বাড়ি বানিয়ে ছিলেন। ছেলে মেয়ে নিয়ে সেই বাড়িতে উঠলেন। তার পর যে কান্ড শুরু হল—সেটা বললে কেউ বিশ্বাস করবে না। ভয়াবহ। মামাও বাঘা তেঁতুল টাইপ। মামা বললেন—ভূতের আমি কেথা পুড়ি। দেখি ভূত কী করে। পয়সা দিয়ে বাড়ি বানিয়েছি ভূতের থাকার জন্য না। আমার থাকার জন্য। ভূতদের হাউজিং প্রবলেম—বাড়ির পেছনে দু'টা শ্যাঁওড়া গাছ লাগিয়ে দিব। শ্যাঁওড়া গাছে প্রেমসে থাক। টগর গল্পটা শুনছ?'

'জি।'

'চোখ বন্ধ করে ফেললে যে। ভাবলাম ঘুমিয়ে পড়েছ। একটা জিনিস খেয়াল রাখবে কেউ যখন গল্প করে তখন চোখ বন্ধ করতে নেই। এটা বিরাট বেয়াদবি। এই কাজ আর কখনো করবে না।'

'জি আচ্ছা।'

‘চা খেতে ইচ্ছা করছে। কী করা যায় বলতো। টি ব্যাগ চিনি দুধ সবই আছে। শুধু গরম পানি পেলে কাজ হত।’

‘গরম পানি কে করবে সবাই তো ঘুমাচ্ছে।’

‘না সবাই ঘুমাচ্ছে না। কুসুম জেগে আছে। তার হাসির শব্দ শুনেছি। মনে হয় সে তার মা’র সঙ্গে গল্প করছে।’

‘কুসুম আপু ঘুমের মধ্যে হাসে।’

‘আমি যে হাসি শুনেছি সেতা ঘুমের হাসি না। ঘুমের হাসি অন্য রকম। তুমি দরজার কাছে গিয়ে তোমার আপুকে ডাক দিয়ে দেখ সে ঘুমাচ্ছে কিনা। একা যেতে ভয় করলে আমি সঙ্গে থাকব। নো প্রবলেম। যাদের চা খেয়ে অভ্যাস তাদের যদি হঠাৎ চায়ের নেশা চাপে তাহলে ভয়ংকর অবস্থা হয়। চা না খাওয়া পর্যন্ত কিচ্ছু ভালো লাগে না। কুসুম ঘুমিয়ে থাকলেও আমাকে চা খেতে হবে। রান্নাঘরে গিয়ে নিজেই চা বানাব। তাতে আমার কোনো সম্মান হানি হবে না। বুঝতে পারছ?’

‘জি।’

‘চল চা খাবার ব্যবস্থা করি তারপর আমি আমার ছোট মামার গল্পটা বলব। দারুণ ইন্টারেস্টিং কুসুম শুনতে চাইলে সেও শুনবে। সে ভয় টয় পাবে বলে মনে হয় না। মেয়েটার মারাত্মক সাহস। মেয়েদের এত সাহসও অবিশ্যি ভালো না। সে যে কীভাবে ব্রিজ থেকে লাফ দিয়ে পানিতে পড়ল এখনো মনে হলে শরীর ঠান্ডা হয়ে যায়। এই ঘটনা যদি ঢাকায় গিয়ে বন্ধু বান্ধবকে বলি কেউ বিশ্বাস করবে না। এদেরও দোষ দেয়া যায় না। ঘটনা আমি নিজের চোখে দেখেছি তারপরেও আমার নিজেরই বিশ্বাস হয় না।’

কুসুম আপু জেগেই ছিল তবে চা বানানোর জন্য সে বের হল না। রহিমা ফুপু বের হলেন। জাপানি ইঞ্জিনিয়ার খুব সংকুচিত গলায় বলতে লাগলেন, আমি খুবই লজ্জিত আপনাকে কষ্ট দিচ্ছি। নেক্সট টাইম একটা ফ্লাক্স দিয়ে দেব। ঘুমুবার আগে শুধু ফ্লাক্স ভর্তি করে গরম পানি রেখে দেবেন।

রহিমা ফুপু লম্বা ঘোমটা দিয়ে থাকলেন। একটা কথারও জবাব দিলেন না। আমার ধারণা রহিমা ফুপু জাপানি ইঞ্জিনিয়ারকে একেবারেই পছন্দ করেন না। তিনি অবিশ্যি তার অপছন্দের কথা কখনোই বলবেন না।

আমরা চা খাচ্ছি বারান্দায়। উনার সাথে আমিও খাচ্ছি। চা খেতে আমার ভালো লাগে না, আমার খারাপও লাগে না। শুধু দোকানের চা খেতে ভালো লাগে। জাপানি ইঞ্জিনিয়ার ভূতের গল্প বলছেন এবং একটু পরপরই ভেতরের দিকে তাকাচ্ছেন। তিনি হয়তো ভাবছেন, কুসুম আপু কিছুক্ষণের মধ্যেই চলে আসবে। বেচারার জন্যে আমার মায়াই লাগছে। গল্প করছেন আমার সঙ্গে অথচ তার মন পড়ে আছে অন্য একজনের জন্যে। আমার নিজের ইচ্ছা করছে ডেকে কুসুম আপুকে নিয়ে আসি। তিনজন না হলে ভূতের গল্প কখনো জমে না। ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের গল্পটা খুব ভয়ের না হলেও খারাপ না।

'বুঝলে টগর আমার সেই মামাও ভয়ংকর সাহসী। কুসুমের মতোই সাহসী। ভূত যত উপদ্রপ করে তার জেদ তত বাড়ে। ভূত নানান ভাবে তাকে বিরক্ত করে। মশারি খাটিয়ে শুতে গিয়েছেন মাঝরাতে দেখা যাবে দড়ি থেকে মশারি খুলে গায়ের উপর ফেলে রাখা হয়েছে। আলনা ভর্তি কাপড় হঠাৎ একদিন দেখা যাবে সব কাপড় ভেজা। কাপড় থেকে টপটপ করে পানি পড়ছে। গোসল করতে লুংগি নিয়ে বাথরুমে ঢুকেছেন। গোসল শেষ করে লুঙ্গি পরতে গিয়ে দেখেন লুঙ্গি নেই। লুঙ্গি দলামচা করে কমোডে ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে। টগর গল্পটা কেমন লাগছে?

'জি ভালো।'

'কুসুম শুনলে মজা পেত।'

'আরেক দিন আপাকে শুনাবেন।'

'ভূতের গল্প বলার মুড সবদিন আসে না। আজকের রাতটা ভূতের গল্প বলার জন্যে ভালো ছিল। দেখ তো জেগে আছে কিনা। জেগে থাকলে পাঁচ মিনিটের জন্য আসতে বল।'

'আমি এখন ডাকতে গেলে রাগ করবে।'

'রাগ করলে আমার উপর রাগ করবে। তুমি তো আর ডাকছ না। আমি ডাকছি। গিয়ে বল খুবই জরুরি কিছু কথা বলব।'

আমি নিতান্তই অনিচ্ছার সঙ্গে উঠে দাঁড়ালাম আর তখনি মা'র ঘর থেকে চাপা চিৎকার ভেসে এল। মনে হচ্ছে কেউ দু'হাতে মা'র গলা চেপে ধরেছে। মা নিঃশ্বাস নেবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করছেন। যে মা'র গলা চেপে ধরে আছে মা তাকে ছাড়াবার চেষ্টা করছেন।

জাপানি ইঞ্জিনিয়ার ধড়মড় করে উঠে দাঁড়ালেন। ভীত গলায় বললেন, কী হয়েছে?

আমি বললাম, কিছু হয় নি।

‘চিৎকার কে করছে। তোমার মা?’

‘জি।’

‘দেখে আসতো কী ব্যাপার।’

‘দেখা যাবে না।’

‘দেখা যাবে না কেন?’

আমি জবাব দিলাম না। জবাব দিতে ইচ্ছা করল না। মা কেন চিৎকার করছেন সেটা দেখা যাবে না, কারণ মা’র ঘর তালাবদ্ধ। তালার চাবি বাবার কাছে। গত এক সপ্তাহ ধরে মা’কে তালাবদ্ধ করে রাখা হচ্ছে। মা’র শরীর আগের চেয়ে অনেক বেশি খারাপ করেছে। দিনের বেলা তিনি বেশ স্বাভাবিকই থাকেন। কারো সঙ্গে কোনো কথাবার্তা বলেন না তবে খাওয়া দাওয়া করেন। খাওয়া শেষ করে ছোট বাচ্চাদের মতো কুন্ডুলী পাকিয়ে ঘুমুতে যান। কিন্তু সন্ধ্যার পর থেকে তিনি অন্য রকম হয় যান। হই চই চিৎকার চেঁচামেচি কিছুই করেন না, শুধু গায়ে কোনো কাপড় রাখতে পারেন না। তাঁর নাকি তখন শরীর জ্বলে যায়। তাঁর ঘরে বালতি ভর্তি পানি থাকে। তিনি সেই পানি মাথায় ঢালেন এবং ঘরের ভেতরই ছোটাছুটি করেন। এ-রকম চলে সারারাত। ফজরের আজানের পর পরই তিনি স্বাভাবিক হয়ে যান। আবার গায়ে কাপড় পরেন। তাঁকে তখন খুবই লজ্জিত মনে হয়।

জাপানি ইঞ্জিনিয়ার উদ্বিগ্ন গলায় বললেন, টগর খোঁজ নিয়ে আস ব্যাপারটা কী?

‘খোঁজ নিতে হবে না।’

‘এমন ভয়ংকর একজন রোগী ঘরে অথচ তোমরা সবাই কি নির্বিকার। আমি এর কারণটা বুঝতে পারছি না। পাবনা মেন্টাল হসপিটালের একজন ডাক্তার আছে ডাক্তার আখলাকুর রহমান। আমার ছেলেবেলার বন্ধু। আমরা এক সঙ্গে স্কুলে পড়েছি। কলেজেও একসাথে পড়েছি—ঢাকা কলেজ। ওর বায়োলজি ছিল বলে ও চলে গেল মেডিকেলে। আমার ছিল জিওগ্রাফী। আমি ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হলাম। আখলাকের কাছে একটা চিঠি দিয়ে তোমার

মা'কে পাঠালে সে সব ব্যবস্থা করবে। ঐখানে চিকিৎসা ভালো হয়। তুমি এক কাজ কর, কুসুমকে ডেকে নিয়ে এসো। তার সঙ্গে ডিসকাস করি।'

আমি কুসুম আপুকে ডাকতে গেলাম না। মা'র ঘরের হই চই খুবই বাড়ছে। এখন মনে হচ্ছে জিনিস ছুঁড়ে দরজায় মারা হচ্ছে কিংবা মা দরজায় মাথা ঠুকছেন। পুরো বাড়িই মনে হয় কাঁপছে।

রহিমা ফুপু বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন।

জাপানি ইঞ্জিনিয়ার বললেন, সমস্যাটা কি একটু বলবেন? আমি যদি কোন সাহায্য করতে পারি।

রহিমা ফুপু শান্ত গলায় বললেন, কোনো সমস্যা নাই। আপনি ঘুমান।

জাপানি ইঞ্জিনিয়ার খুবই অবাক হচ্ছেন। সমস্যা নেই বললে তো হবে না। বোঝাই যাচ্ছে বিরাট সমস্যা। ঘর দোয়ার ভেঙ্গে ফেলার মতো অবস্থা।

রহিমা ফুপু আমার দিকে তাকিয়ে কঠিন গলায় বললেন, টগর তোর বাবাকে ডেকে নিয়ে আয়। তালা খুলতে হবে।

জাপানি ইঞ্জিনিয়ারের চিঠি নিয়ে মা'কে পাবনা হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা হয়েছে। সঙ্গে বাবা যেতে পারছেন না, তার ছুটি নেই। আব্দুর রহমান চাচার হাতে ইস্টিশন ফেলে রেখে তিনি যেতে পারেন না। ভাইয়াও যেতে পারছে না। তার নতুন চাকরি, এখনই ছুটি নিলে চাকরি নট হয়ে যাবে। তাছাড়া তাদের অফিসে এক বিদেশিনী এসেছেন। এনজিওর কাজ-কর্ম কেমন হচ্ছে তা তিনি ঘুরে দেখবেন। ভাইয়ার এখন প্রধান দায়িত্ব সেই মহিলাকে সঙ্গে নিয়ে গ্রামে-গঞ্জে ঘুরা। ভাইয়া এই কাজ অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে করছে। তার মুখে কয়েকদিন ধরেই এই মহিলার কথা ছাড়া অন্য কোন কথা নেই। ভদ্রমহিলার নাম এলেন। সবাই ডাকে মিস এলেন। থুড়থুড়ি বুড়ি হয়ে যাবার পরও বিয়ে করেন নি বলেই মিস এলেন। ভদ্রমহিলাকে আমি দেখেছি। ঠোঁটে গাঢ় করে লিপস্টিস দেয়া। মাথায় লাল রঙের টুপি। হাঁটার সময় হাতে বেতের একটা লাঠি আছে। বুড়ো মানুষেরা যে কারণে লাঠি ব্যবহার করে উনি সেই কারণে করেন না। লাঠিটা তার শোভা।

প্রতিদিনই এই বুড়ির গল্প না বললে ভাইয়ার মনে হয় অস্থির লাগে। আমি সব গল্পই আগ্রহ করে শুনি। বুড়ি মিস এলেনের গল্প শুনতেও আমার ভালো লাগে।

'বুঝলি টগর। বুড়ির স্বাস্থ্য দেখে বোঝার উপায় আছে যে চার মাইল কাদা মাখা রাস্তা সে জোর কদমে হাঁটতে পারে? আমি একেবারে 'থান্ডার' হয়ে গেছি। হাসে আর ফুস ফুস করে সিগারেট খায়। খুবই লজ্জার কথা—একদিন আবার আমাকে সাধল। আমি মিথ্যা করে বললাম— ডোন্ট স্মোক।

'তোমাকে মনে হয় খুব পছন্দ করে।'

'পছন্দ তো করেই। এটা নিয়ে হয়েছে সমস্যা, বাংলাদেশের কারবার। কেউ কারো ভালো দেখতে পারে না। অফিসে যেই টের পেয়ে গেল মিস এলেন আমাকে পছন্দ করেন। ওম্নি দলাদলি। ছগির বলে অফিসে খানকির পুলা আছে। আমার বদলে মিস এলেনের ডিউটি তাকে করতে দিল।'

'সে কী।'

‘কোনো লাভ হয় নি। মিস এলেন পরিষ্কার বলে দিলেন—রন্টু কুটায়? রন্টু। বিদেশীদের জিব্বা ভারী থাকে এরা কঠিন বাংলা শব্দ বলতে পারে না। আমাকে ডাকে রন্টু।’

‘বাংলা জানেন?’

‘ভালো বাংলা জানে। মাঝে মাঝে উনার বাংলা শুনে আমি ‘থান্ডার’ হয়ে যাই। ঐ দিন কি হয়েছে শোন—এক বাড়িতে গিয়েছি। বাড়ির ভেতর থেকে এক লোক বের হয়ে বলল, বুইড়া মাগী কী চায়? মিস এলেন তার কথা শুনে শান্ত গলায় বললেন—মহিলাকে মাগী বলিবে না। মাগী গালাগালি ভালো নহে। ইহা অশোভন গালাগালি।’

‘উনি তো দেখি ভালো বাংলা শিখেছেন।’

‘বিদেশী তো। এরা ইশারাতেই সব ধরে ফেলে। আমরা ডালে ডালে চললে ওরা চলে পাতায় পাতায়। আমরা পাতায় পাতায় চললে ওরা চলে শিরায় শিরায়।’

‘তোমার কাজে উনি খুব খুশি?’

‘ওদের খুশি-অখুশি বোঝা মুশকিল। খুশি হলেও এরা কিছু বলবে না, আবার অখুশি হলেও কিছু বলবে না। তবে আমাকে যে অত্যন্ত স্নেহ করে এটা বোঝা যায়।’

‘কীভাবে বুঝলে? তোমাকে কিছু বলেছেন?’

‘আমাকে নিয়ে একটা ছড়া বানায়ে ফেলেছে—বুঝলি না।’

‘কী ছড়া?’

‘সাইকেল নিয়ে বের হই – টুনটুন করে ঘন্টা বাজাই সেটা নিয়ে ছড়া

“সাইকেল টিং টিং
রন্টু পাগলা শিং
হা হা লাফটার
রন্টু বিগ স্টার।”

মা’র চলে যাবার দিন ভাইয়া থাকতে পারল না। মিস এলেনকে নিয়ে তার মুলাদী গ্রামে প্রোগ্রাম। সেই গ্রামে পনেরো জনকে সেনিটারি পায়খানা দেয়া

হবে। গর্ত করে রিং স্ল্যাভ বসানো হবে। একজন বয়াতীকে আনা হয়েছে সে তার দলবল নিয়ে স্যানিটারি পায়খানার উপকারিতা নিয়ে গান করবে। পুরো অনুষ্ঠান ভিডিও করা হবে। বিরাট ব্যবস্থা। স্যানিটারি পায়খানার গানের একটা ক্যাসেট ভাইয়া নিয়ে এসেছে। জাপানি ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের ক্যাসেট প্লেয়ারে বাজিয়ে সেই গান আমরা শুনেছি। ভাইয়া চোখ বড় বড় করে বলল— বাংলাদেশের গ্রামে গঞ্জে এই গান আমরা ছড়িয়ে দেব। একটা 'হুলুস্থুলুস' পড়ে যাবে। ভাইয়া হুলুস্থুল বলতে পারে না। বলে হুলুস্থুলুস। বুঝলি টগর, লোকের মুখে মুখে গান ফিরবে। আমাদের কর্ম পদ্ধতি মারাত্মক। গানের মাধ্যমে শিক্ষা। ভাইয়া এমন ভাবে কথা বলে যেন গানটা সে নিজেই গেয়েছে। এবং এই গান গ্রামে গঞ্জে ছড়ানোর ব্যবস্থাও সে নিজেই করেছে। ভাইয়া নিজেও গোসল করার সময় গানটা গায়। তার গলা খারাপ না, শুনতে ভালোই লাগে –

শুনেন শুনেন দশজনাতে শুনেন দিয়া মন
উন্নত পায়খানার কথা করিব বর্ণন।
আহা পায়খানারে। আহা পায়খানা রে।।
দশফুট গর্ত হবে কোনো চিন্তা নাই
তার উপরে স্লাভ বসিবে বলে দিয়া যাই
স্লাভের উপর রিং বসিবে বলি পরিষ্কার
উন্নত পায়খানা হলে চিন্তা নাইকো আর
আহা পায়খানারে। আহা পায়খানারে।।

মা'কে পাবনা মেন্টাল হসপিটালে নিতে এসেছেন মায়ের দুই ভাই। দুই জনই বয়সে মা'র ছোট। কিন্তু কেমন বুড়োটে দেখাচ্ছে। একজনের চুল দাড়ি পেকে শাদা। তার বোধ হয় হাঁপানি রোগও আছে। আসার পর থেকে হাঁপাচ্ছেন। মা'র সঙ্গে দু'জনই খুব স্বাভাবিক গলায় কথা বলছেন। যেন মা'র কোনো অসুখবিসুখ নেই। তিনি সুস্থ মানুষ। আমি এই দুই মামাকে আগে কখনো দেখেছি বলে মনে করতে পারলাম না। কিন্তু তারা আমার সঙ্গেও এমন ভাবে কথা বললেন যেন প্রায়ই আমাদের দেখা সাক্ষাৎ হয়। দুই মামার একজনের নাম হারুন। তার চেহারা সুখি সুখি। তিনি মনে হয় কথা বলতেও

পছন্দ করেন। সবার সঙ্গে আন্তরিক ভঙ্গিতে কথা বলছেন। তিনি পান খেতে খেতে মা'কে বললেন – আপনার সুখের সংসার দেখে চক্ষু জুড়ায়ে গেছে বুবু। আপনার বড় ছেলের সঙ্গে এখনো দেখা হয় নাই। ছোটজনকে দেখে চক্ষু জুড়ায়ে গেছে। দুলাভাই এর কাছে শুনলাম বড়জন এনজিওতে চাকরি করে। শুকুর আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ্ পাকের খাস রহমত ছাড়া এটা সম্ভব না।

মা মনে হয় মামার কথা কিছুই বুঝলেন না। লম্বা ঘোমটা টেনে ফিস ফিস করে বললেন—আপনাদের খাওয়া দাওয়া হয়েছে?

হারুন মামা উৎসাহের সঙ্গে বললেন, আমাদের খাওয়া দাওয়া নিয়ে মোটেই চিন্তা করবেন না বুবু। আসার পর থাইকা খাওয়া খাদ্যের উপর আছি। আপনার শরীরটা খারাপ হয়েছে শুনে অত্যন্ত চিন্তাযুক্ত। তবে ইনশাল্লা সুচিকিৎসা হবে। সুস্থ হওনের পর বুবু আপনাকে দেশের বাড়িতে কয়েক দিনের জন্যে নিয়া যাব। খুবই গরিবি হালতে আছি আপনার কষ্ট হবে। বাপের বাড়ির কষ্ট অবশ্য গায়ে লাগে না। দুলাভাই এর সঙ্গে এই বিষয়ে আলাপ হয়েছে। দুলাভাই মত দিয়েছেন। বাকি আল্লাহপাকের ইচ্ছা।

মা আবারো ফিস ফিস করে বললেন আপনাদের খাওয়াদাওয়া হয়েছে।

মা'র কথাবার্তার কোনো ঠিক ঠিকানা না থাকলেও তিনি তাঁর দুই ভাইকে দেখার পর থেকেই খুব স্বাভাবিক আচরণ করছেন। চিৎকার হই চই নেই। ঘোমটা দিয়ে বসে আছেন। বাবা যখন বললেন—বৌ যাও কয়েকটা দিন বেড়ায়ে আস। মা সঙ্গে-সঙ্গে সুবোধ বালিকার মতো ঘাড় নাড়লেন। এবং ফিক করে হেসে ফেললেন।

রহিমা ফুপু মার সব কাপড় চোপড় গুছিয়ে দিয়েছেন। মা'র সুটকেসে বাবা কিছু টাকাও দিয়ে দিয়েছেন। টাকা, চিঠি লেখার পোস্ট কার্ড। বল পয়েন্ট কলম।

'বৌ মনে করে চিঠি লিখবে। তোমার লিখতে ইচ্ছা না করলে, হাসপাতালে ডাক্তার আছে, নার্স আছে। তাদেরকে বললেই চিঠি লিখে দিবে। পোস্ট কার্ডে ঠিকানা লেখাও আছে।'

'জি আচ্ছা।'

'খাওয়া দাওয়া ঠিক মতো করবা। অষুধ পত্র খাবার ব্যাপারে অনিয়ম করবা না।'

'জি আচ্ছা।'

'সময় সুযোগ হলেই তোমাকে দেখতে যাব। প্রতি মাসেই কেউ-না-কেউ যাবে। কোনোবার আমি, কোনোবার যাবে রঞ্জু।'

'জি আচ্ছা।'

ট্রেন বিকেলে। দুপুরের পর থেকে মা'কে খুব খুশি-খুশি লাগতে লাগল। তিনি কারো সঙ্গে কোনো কথা বলছেন না, কিন্তু সবার দিকেই হাসি মুখে তাকাচ্ছেন। তাঁর চোখ দেখে মনে হচ্ছে তিনি সবাইকে চিনতে পারছেন। আমি কাছে গিয়ে বললাম, মা আমাকে চিনেছ?

মা হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়লেন। আমি বললাম, বলতো আমি কে?

মা বললেন, তুই টগর।

'তোমার মাথার যন্ত্রণা কি কমে গেছে?'

'হ্যাঁ।'

'তুমি কোথায় যাচ্ছ জান?'

'পদ্মনগর।'

'তুমি পদ্মনগর যাচ্ছ না মা, তোমাকে হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছে। ওরা তোমার চিকিৎসা করবে। তুমি ভালো হয়ে ফিরে আসবে।'

'আচ্ছা।'

আমি মা'র গা ঘেঁসে বসে রইলাম। খুব কাছে বসলাম যেন ইচ্ছা করলেই মা আমার গায়ে হাত রাখতে পারেন। মা তা করলেন না। চুপচাপ বসে রইলেন, তবে মাঝে মধ্যেই কৌতূহলী চোখে আমার দিকে তাকাতে লাগলেন। তাঁর ঠোঁটে ফিক ফিক হাসি লেগেই রইল।

দুপুরে খেতে বসে দুই মামার ভেতর কী নিয়ে যেন লেগে গেল। চাপা গলায় একজন আরেকজনের সঙ্গে কথা বলছেন, কটমট করে তাকাচ্ছেন। ভয়ংকর কিছু হচ্ছে তা বোঝা যাচ্ছে, কিন্তু তার ফাঁকে খাওয়াদাওয়া ঠিকই করছেন। এক ভাই আবার আরেক ভাইকে সাধাসাধিও করছেন—'মাছ নিবা আরেক পিস?'

আমি কৌতূহলী হয়ে একবার জিজ্ঞেস করলাম, 'মামা কী হয়েছে?' হারুন মামা মধুর ভঙ্গিতে হাসতে হাসতে বললেন, 'কিছু না বাপধন। সংসারী আলাপ। সংসারী আলাপে একটু আধটু "হিট" হয়। এইটা কিছু না।'

সংসারী আলাপের রহস্য কিছুক্ষণের মধ্যেই জানা গেল। হারুন মামা খাওয়া শেষ করে পান মুখে দিতে দিতে বাবাকে বললেন, ‘দুলাভাই বুবুর যাতায়াত এবং চিকিৎসার খরচা আপনে বড় ভাই এর হাতে দিয়েছেন। এইটা ঠিক না। আমরা দুই জনে বুবুরে নিয়া যাইতেছি। খরচা সমান দুই ভাগ কইরা দুইজনের হাতে দেন।’

বাবা বললেন, ‘একজনের কাছে দিলেই তো হয়।’

হারুন মামা বললেন, ‘হয় না। সংসার অত সহজ না। বড় ভাই এর কাছ থাইক্যা দুইটা টাকা বাইর করা আমার পক্ষে সম্ভব না। বাকি আপনার বিবেচনা। আমি আমার ব্যবসা বাণিজ্য সব ফালাইয়া রওনা হইছি আর টেকা বগলে নিয়া বইস্যা আছে আরেকজন। এই রকম হইলে তো আমার যাওয়া সম্ভব না। আমারে বিদায় দেন।’

‘এইসব কী বলছ?’

‘আমি পরিষ্কার মানুষ। আমার পরিষ্কার কথা। খরচার টেকা দুই ভাগ হবে। সমান সমান ভাগ। যদি তা হয় আমি আছি। যদি না হয়—থুক্কু।’

‘বোনের জীবন মরণ সমস্যা আর তুমি বলে ফেললে – থুক্কু।’

হারুন মামা আরেকটা পান মুখে দিতে দিতে বললেন, ‘আমি পরিষ্কার মানুষ। পরিষ্কার কথা বললাম। এখন জামানা খারাপ। পরিষ্কার কথা কারোর ভালো লাগে না।’

বাবা এই ঝামেলা কীভাবে মেটালেন আমি জানি না। দেখা গেল দুই ভাইই অত্যন্ত আনন্দিত মুখে বোনকে নিয়ে ট্রেনে উঠলেন। হারুন মামা ট্রেনের জানালা থেকে গলা বের করে বললেন। ‘দুলাভাই লিশ্চিন্ত থাকেন। আমরা দুই ভাই থাকতে কোনো অসুবিধা হবে না বাকি আল্লাহপাকের মর্জি।’

ট্রেনে উঠে মা’র আনন্দ খুব বাড়ল। তাঁর মুখে পান। একটু পর-পর তিনি জানালা দিয়ে মুখ বের করে পানের পিক ফেলছেন, এবং ছোট বাচ্চাদের মতো হাসছেন।

মা’কে বিদায় দিতে আমরা সবাই ইস্টিশনে এসেছি। বাবা দাঁড়িয়ে আছেন কুঁজো হয়ে। দুপুরের পর থেকে তাঁর পেটে ব্যথা শুরু হয়েছে। আজকের ব্যথাটা মনে হয় তীব্র। কারণ তাঁর মুখ কালো হয়ে গেছে। তিনি একটু পর পর হাতঘড়িতে সময় দেখছেন। ব্যথা উঠলেই তিনি ঘড়ি দেখেন। বাবার পাশে

রহমান চাচা দাঁড়িয়ে আছেন। রহমান চাচা বাবার কানে-কানে কি যেন বলছেন। বাবা ক্লান্ত ভঙ্গিতে হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়ছেন। রহিমা ফুপু একটু দূরে একা দাঁড়িয়ে আছেন। সব সময় তার মাথায় ঘোমটা থাকে। আজ তার মাথায় ঘোমটা নেই। আমি দাঁড়িয়ে আছি কুসুম আপুর পাশে। কুসুম আপুর চোখ দিয়ে ক্রমাগত পানি পড়ছে। কুসুম আপু এত কাঁদছে কেন আমি বুঝতে পারছি না। মা'র সঙ্গে তার কখনোই কোনো খাতির ছিল না। মা যখন সুস্থ থাকেন তখনও কুসুম আপুর সঙ্গে কথা বলতেন না। বরং তাকে দেখলে মা'র ভুরু সামান্য কুঁচকে যেত। চোখের দৃষ্টি কঠিন হয়ে যেত।

ভাইয়ার ইস্টিশনে আসার কথা না। বুড়ি মিস এলেনের সঙ্গে তার প্রোগ্রাম। কিন্তু ভাইয়া ঝড়ের বেগে সাইকেল চালিয়ে উপস্থিত হল। মনে হয় সে অনেক দূর থেকে এসেছে আর শার্ট ঘামে ভেজা। চোখ লাল। বড় বড় নিঃশ্বাস নিচ্ছে।

ভাইয়াকে দেখে বাবা অসম্ভব খুশি হলেন। মনে হল হঠাৎ তাঁর পেটের ব্যথাটা কমে গেছে। তিনি ভাইয়ার দিকে তাকিয়ে হাসি মুখে বললেন, 'বাবা যাও। মা'কে কসমবুসি করে আস। ট্রেন এখন ছেড়ে যাবে। এম্নিতেই দুই মিনিট বেশি রেখেছি।'

ভাইয়া নড়ল না। সাইকেল ধরে হাঁপাতে লাগল। বাবা রহমান চাচার হাত থেকে সবুজ ফ্ল্যাগ নিয়ে উড়িয়ে দিলেন। ট্রেন চলতে শুরু করল। মা'র দৃষ্টি এতক্ষণ এলোমেলো ছিল, ট্রেন চলতে শুরু করা মাত্র তিনি কেমন যেন অস্থির হয়ে গেলেন। অবাক হয়ে সবার দিকে তাকাতে লাগলেন। মনে হল কী ঘটছে তিনি বুঝতে পারছেন না।

আমরা সবাই ট্রেনের সঙ্গে সঙ্গে আসছি শুধু বাবা সবুজ ফ্ল্যাগ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। ফ্ল্যাগ নাড়াচ্ছেন। ভাইয়া হঠাৎ বলল, 'টগর সাইকেলটা ধরত।'

আমি সাইকেল ধরলাম। ভাইয়া ছুটে গিয়ে চলন্ত ট্রেনে লাফ দিয়ে উঠে পড়ল। যে জানালা দিয়ে মুখ বের করে মা আমাদের দেখছিলেন সেই জানালা দিয়ে সেও মুখ বের করল। মা হাত নাড়াচ্ছে, মা'র সঙ্গে সঙ্গে ভাইয়াও হাত নাড়াচ্ছে।

বাবা প্লাটফর্মে বসে পড়েছেন। পেটের ব্যাথাটা আজ মনে হয় খুবই বেড়েছে। রহমান চাচা বাবার হাত ধরে আছেন। বাবা খুব কাঁদছেন। আমি কাছে যেতেই বাবা আমাকে ইশারা করলেন পাশে বসতে। আমি বসলাম। বাবা ফিসফিস করে বললেন, রঞ্জু যে কাজটা করেছে তার জন্যে আল্লাহপাক তার উপর খুবই সন্তুষ্ট হয়েছেন বলে আমার বিশ্বাস। আল্লাহপাকের সন্তোষ লাভ করা ভাগ্যের ব্যাপার। আমার বড় পুত্র বড়ই ভাগ্যবান।

বাবা খুবই কাঁদছেন। আমি বললাম, তোমার পেটে ব্যথা কি খুব বেশি? বাবা চোখ মুছতে মুছতে বললেন, হ্যাঁ, ব্যাথাটা বাড়তেছে। মনে হচ্ছে পেটে কয়লার চুলা বসায়ে কেউ রান্না করতেছে।

রাতে বাবার ব্যথা খুবই বাড়ল। তিনি ছটফট করতে লাগলেন। রহমান চাচা ডাক্তারকে খবর দিয়ে আনলেন। ডাক্তার সাহেব চোখ মুখ কুঁচকে বললেন, সদর হাসপাতালে নেয়া উচিৎ। এ্যাপেনডিক্স বার্স্ট করলে এমন হয়, আবার ধরেন আলসারও হতে পারে। পাকস্থলী ফুটা হয়ে গেছে।

কুসুম আপু বলল, আপনার হাতে কোনো চিকিৎসা নাই?

ডাক্তার সাহেব বললেন, ঘুম চিকিৎসা আছে। ঘুম পাড়ায়ে দিতে পারি । ঘুম ভাঙলে আবার ব্যথা শুরু হবে।

‘দিন আপাতত ঘুম পাড়িয়ে দিন।’

ডাক্তার সাহেব চারটা ঘুমের ট্যাবলেট খাইয়ে দিয়ে গলা অস্বাভাবিক নিচু করে বললেন, আমার আসল সন্দেহ ক্যানসার। পুরাতন ব্যাধির কথা বললেন তো – পুরাতন ব্যাধি একটাই ক্যানসার। হ্যাজ নো আনসার। হয়ে গেলে উপায় নাই। ডাক্তার কবিরাজ গুলে খাইয়ে দিলেও কোনো লাভ নাই। ডাক্তার কবিরাজ হজম হয়ে যাবে ক্যানসারের কিছু হবে না।

আজ সারাদিন জাপানি ইঞ্জিনিয়ারের কোনো খোঁজ ছিল না। তাঁর কাছে আবারো ইন্সপেকশন টিম এসেছে। ক্রেন চালক জামশেদ দলবল নিয়ে ইন্সপেকশন টিমের সঙ্গে এসেছে। শুধু তাই না এবার দলের সাথে সত্যিকার বিদেশী ইঞ্জিনিয়ারও একজন এসেছেন। মগরা ব্রিজের রিপেয়ারের কাজ চীন সরকারের সাহায্যে হচ্ছে বলেই একজন চীনাম্যান এসেছেন। চীনাম্যানের নাম—আনতাং বা এই রকম কিছু। ব্রিজের রিপেয়ার কাজ যতদিনই চলবে ততদিনই তিনি এখানে থাকবেন।

জাপানি ইঞ্জিনিয়ার চীনাম্যানকে নিয়ে রাতে আমাদের বাসায় খেতে এলেন। বাবার অবস্থা দেখে দু'জনই হতভম্ব। বাবা এই অসুস্থ অবস্থায়ও বিনয়ে গলে গিয়ে বার-বার বলতে লাগলেন—"ভেরি হ্যাপী। মাই হ্যাপীনেস নোজ নো বাউন্ড। প্লীজ হ্যাভ রাইস। উই আর পুওর বেঙ্গলি। অনলী রাইস এন্ড কারি। নাথিং এলস।"

চীনাম্যান বোধ হয় ইংরেজি জানে না। বাবার প্রতিটি কথায় হাসিমুখে হ্যাঁ সূচক মাথা ঝাঁকাল। তারপর চা-টা কিছুই না খেয়ে চলে গেল।

বাবার পেট ব্যথা বাড়তেই থাকল। ডাক্তারের দেয়া ঘুমের অষুধে কিছু হল না। জাপানি ইঞ্জিনিয়ার আবারো ডাক্তার সাহেবকে ডেকে আনতে পাঠালেন। তিনি ফিরলেন ডাক্তার না নিয়েই। ডাক্তার সাহেব উত্তর পাংশায় কলে গিয়েছেন। রাতে ফিরবেন না। রহমান চাচা ডাক্তার নিয়ে না ফিরলেও ভালো খবর নিয়ে ফিরলেন। মেট্রিকের রেজাল্ট হয়েছে। কুসুম আপু পাশ করেছে।

কুসুম আপু বলল, পাশ তো অনেক রকম। আমি কী রকম পাশ করলাম?

রহমান চাচা বললেন, সেটা মা আমি জানি না। পাশ করছ এইটা জানি। পাশ করছ এর জন্যেই আল্লার দরবারে শোকর গুজার কর। তোমার ভাই রঞ্জু ফেল হয়েছিল। সে ছেলে হইয়াও কিন্তু পাশ দিতে পারে নাই। তার বুদ্ধিও কোনো অংশে কম না। বরং অত্যধিক বেশি। ছোট থেকে তারে আমি দেখেছি এই অঞ্চলে এমন কোনো ছেলে ছিল না যে তার সাথে মারবেল খেলায় পারে। দুইটা মার্বেল একটার গায়ে একটা লাইগ্যা আছে এর মধ্যেও তুমি যদি বল পশ্চিমেরটারে মার। হে পশ্চিমেরটারে মারব।

কুসুম আপু বিরক্ত হয়ে বলল, আমি যে পাশ করেছি এইটাই আপনাকে কে বলল?

'কেউ বলে নাই। আমি গাঁজাখোর মানুষ। আগবাড়াইয়া কে আমারে খবর দিব?'

'তাহলে জানলেন কীভাবে?'

'বাজারে আলোচনা।'

'কী অদ্ভুত কথা। আমি পাশ করেছি না ফেল করেছি এটা নিয়ে বাজারে আলোচনা হবে কেন?'

'সেইটা তো আম্মাজি আমি জানি না। আলোচনা হইতেছে শুনছি। বিশ্বাস করা-না-করা আপনের বিবেচনা। আমি গাঁজাখোর। গাঁজাখোর যে কথাই কয় মনে হয় মিথ্যা। এইটা হইল গাঁজাখোরের কপাল। মদখোরের কপাল আবার ভালো। মদখোর যাই কয় সবেই ভাবে সত্য কথা বলতেছে।'

রহমান চাচা সত্যি কথাই বলেছিল। কুসুম আপু পাশ করেছে এবং তার পাশ নিয়ে বাজারে আলোচনা হচ্ছে। কুসুম আপু খুব সাধারণ পাশ করে নি। ঢাকা বোর্ডে ছেলে মেয়ে সবার মধ্যে ফোর্থ হয়েছে। লেটার পেয়েছে ছয়টা। বিন্ধুবাসিনী স্কুলের হেডমাস্টার সাহেব তার স্কুলের সব শিক্ষকদের নিয়ে রাত ন'টার সময় চলে এলেন। তিনি আরো আগেই আসতেন স্যাকরার দোকানে গোল্ডমেডাল বানাতে গিয়ে দেরি হয়ে গেল। গোল্ড মেডালটা হেডমাস্টার সাহেব নিজ খরচায় দিচ্ছেন। তার মায়ের নামে মেডালের নাম মোসাম্মত মনোয়ারা খাতুন স্বর্ণপদক। এই স্বর্ণপদক। এই স্বর্ণপদক শুধুমাত্র বিন্দুবাসিনী স্কুলের মেয়েদের জন্যে প্রযোজ্য। এই স্কুলের কোনো মেয়ে যদি বোর্ডে দশজনের মধ্যে থাকতে পারে তবেই সে এই পদক পাবে।

বাবার পেটে ব্যথা সেরে গেল। তিনি গা ঝাড়া দিয়ে উঠে বসলেন। জাপানি ইঞ্জিনিয়ার যে ব্যস্ততা দেখালেন তাও দেখার মতো। এত বড় সুসংবাদ নিয়ে লোকজন আসছে তাদের শুধু মুখে দেয়া যায় না। তিনি আমাকে নিয়ে মিষ্টি আনতে গেলেন। শুধু মিষ্টি না, চা পাতা, চিনি এবং চায়ের দুধও কেনা হল। এবং জাপানি ইঞ্জিনিয়ার নিজেই চা বানাতে রান্না ঘরে ঢুকে গেলেন। রহিমা ফুপু একবার শুধু বলেছিলেন—ছিঃ ছিঃ আপনি কেন? জাপানি ইঞ্জিনিয়ার গম্ভীর মুখে বললেন, আপনি শুধু দেখুন। চা আম ভালোই বানাতে পারি। একা একা দীর্ঘদিন চা বানিয়ে এমন এক্সপার্ট হয়েছি। হা হা হা। জাপানে আমি একবার কম্পিটিশনে চা বানিয়ে ফার্স্ট প্রাইজ পেয়েছিলাম।

শ্রীলংকার এক ছেলে, আমি, পাকিস্তানের একজন, ইন্ডিয়ার মাদ্রাজের একজন, আরেকজন জাপানি মেয়ে এই পাচজনের মধ্যে কম্পিটিশন। যার চা সবচে ভালো হবে সে পাবে এক হাজার ইয়েন। জাজ ছিলেন ব্রিটিশ এক ভদ্রলোক। এক হাজার ইয়েন আমিই পেয়েছিলাম।

অন্য সময় জাপানি ইঞ্জিনিয়ার মিনিটে মিনিটে কুসুম আপুর খোঁজ করেন। আজ তা করছেন না। মহানন্দে চা বানাচ্ছেন। আমি তার হেল্পার। আজ আমার

সঙ্গেই গল্প করছেন। আগ্রহ নিয়েই গল্প করছেন। গল্পের বিষয়বস্তু অবশ্য কুসুম আপু।

'বুঝলে টগর, তোমার বোন যখন ব্রিজের উপর থেকে ঝাঁপ দিল তখনি আমি বুঝেছি এই মেয়ে সাধারণ মেয়ে না। এ মেয়ে হল 'মাকিউকি' টাইপ। 'মাকিউকি' কি তাতো জান না। মাকিউকি হল যারা প্রতিভা জনিত কারণে একসেন্ট্রিক। মাকিউকি একটা জাপানি শব্দ। ভালো কথা একসেন্ট্রিক শব্দের মানে জান? একসেন্ট্রিক ইংরেজি শব্দ—এর মানে বায়ুগ্রস্ত। ঠিক পাগল না, আবার ঠিক সুস্থও না। ছোটদের সঙ্গে গল্প করার এই হল সমস্যা। প্রতিটি স্টেপ ব্যাখ্যা করে করে এগুতে হয়। গল্পের মূল ফ্লো যায় নষ্ট হয়ে। আমি কি ঠিক করেছি জান? আমি ঠিক করেছি কুসুমকে ম্যাথমেটিক্স পড়াব। ম্যাথ বিষয়ে সবার মধ্যে অকারণ ভীতি কাজ করে। ভালো ছেলেমেয়েরা আবার অন্যদের কাছে শুনে কম্পিউটার সায়েন্স এস্ট্রোফিজিক্স এইসব পড়তে চায়। সায়েন্সের মূল বিষয় হল ম্যাথ।'

'জি।'

'যদিও ম্যাথ কিন্তু বিজ্ঞান না। এই ভুলটা সবাই করে। ম্যাথ বললেই মনে করে সায়েন্স। ম্যাথ হল বিজ্ঞানকে বোঝার একটা টুল। টুল মানে জান?'

'জি না।'

'টুল মানে যন্ত্রপাতি।'

'ও'

'কুসুমের সঙ্গে কথা বলতে হবে, দেখি সে রাজি হয় কিনা। অবশ্য আমি যা বলব তাতেই সে রাজি হবে।'

'না, রাজি হবে না। উল্টো হবে। কুসুম আপু যা বলবে তাতেই আপনি রাজি হবেন।'

'কেন?'

'কারণ কুসুম আপুর শরীরে একটা বিশেষ চিহ্ন আছে। এই চিহ্ন যার শরীরে থাকে সব পুরুষ তার কথা শুনে।'

'তোমাকে কে বলেছে?'

'কুসুম আপু।'

'চিহ্নটা কী?'

‘চিহ্নটা কী আপনাকে বলা যাবে না।’

জাপানি ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের বোধ হয় সারারাত গল্প করার পরিকল্পনা ছিল। তিনি তা করতে পারলেন না। সাইট থেকে তাকে নেবার জন্যে লোক এসেছে। চীনাম্যানের সঙ্গে ক্রেইনের ড্রাইভার জমশেদের কী নাকি গন্ডগোল হয়েছে। সিরিয়াস ঝামেলা হচ্ছে। তিনি না গেলেই না।

এত বড় একটা পাশ করার পরেও কুসুম আপু খুব স্বাভাবিক। যেন তার কিছুই হয় নি। রহিমা ফুপু বললেন, কিরে মেডেলটা খুলে রাখলি কেন। গলায় দে।

কুসুম আপু বলল, আমি কি বিড়াল যে গলায় ঘন্টা বেঁধে ঘুরব।

‘এটা সোনার মেডেল এটা ঘন্টা নাকি?’

কুসুম আপু আমাকে ঘুম থেকে তুলল। ফিস ফিস করে বলল, আজ একটা আনন্দের ঘটনা ঘটেছে সেই উপলক্ষে তোকে আমি আমার চিহ্নটা দেখাব। কি দেখতে চাস? ভ্যাবদার মতো বসে থাকবি না। দেখতে চাইলে মাথা নাড়।

আমি হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়লাম।

কুসুম আপু সঙ্গে সঙ্গে বলল, আজ না আরেক দিন।

মাকে হাসপাতালে ভর্তি করিয়ে ভাইয়া ফিরে এসেছে। ভর্তির ব্যাপারে কোনো সমস্যা হয় নি। জাপানি ইঞ্জিনিয়ারের বন্ধু সব করিয়ে দিয়েছেন। এবং ভাইয়াকে ডেকে বলেছেন, তুমি কোনো দুশ্চিন্তা করবে না। তোমার মায়ের ভালো চিকিৎসা হবে। তার অবস্থার উন্নতি অবনতি যাই হয় আমরা চিঠি দিয়ে জানাব। হাসপাতালের খাওয়া দাওয়ার সমস্যা আছে। করার কিছু নাই। হেড আয়াকে কিছু টাকা পয়সা দিয়ে যাও, বাইরে থেকে এটা সেটা কিনে খাওয়াবে। এদেরকে হাতে রাখা ভালো। রোগীর আসল দেখাশোনা এরাই করে।

ভাইয়া হেড আয়ার হাতে পাঁচশ টাকা এবং হেড নার্সের হাতে পাঁচশ টাকা দিয়ে এসেছে। বাবা বললেন, এত টাকা তুই পেয়েছিস কোথায়?

'অফিসের টাকা। অফিসের বারো'শ টাকা আমার কাছে ছিল।'

'আমার কাছ থেকে টাকাটা নিয়ে দিয়ে আয়।'

ভাইয়া বলল, আচ্ছা।

অফিসে টাকা ফেরত দেওয়ার ব্যাপারে তার কোনো আগ্রহ দেখা গেল না। অফিসে যাবার ব্যাপারে তার আর উৎসাহ নেই। অনেক বেলা পর্যন্ত ঘুমায়। ঘুম থেকে উঠে রেস্টুরেন্টে যায় চা খেতে। চা খেয়ে চলে আসে ইস্টিশনে। ইস্টিশনে এসে রেল লাইনে পা রেখে ঝিম ধরে বসে থাকে। দূর থেকে দেখলে মনে হয় টেলিগ্রাফের তারে কাক বসে আছে। কাকরা যেমন মাথা ঝাঁকায়, ভাইয়াও মাথা ঝাঁকায়।

রহমান চাচার ধারণা রেল লাইনে বসে থাকা খুবই অলক্ষণ। কেউ ঘন-ঘন রেল লাইনে বসলে রেল লাইন তাকে চিনে ফেলে। নিশি রাতে ডাকাডাকি শুরু করে। রেল লাইনের ডাক, নিশি ডাকের মতোই মারাত্মক। রেল লাইন মানুষটাকে ডেকে ঘর থেকে বের করবে। তারপর ভুলিয়ে ভালিয়ে কোনো এক নিশুতি রাতে তাকে কাছে টানবে। বেচারা ঘোরের মধ্যে লাইন ধরে হাঁটতে থাকবে, বুঝতেও পারবে না পেছন থেকে ঝড়ের গতিতে আসছে চিটাগাং মেইল, কিংবা বাহাদুরাবাদ এক্সপ্রেস। সে ট্রেনের শব্দ ঠিকই শুনবে, কিন্তু ভাববে বাতাসের শব্দ। ট্রেনের ড্রাইভার যখন বাঁশি বাজাবে সেই শব্দও তার

কানে যাবে। কিন্তু সে ভাববে বনের ভেতর থেকে শীস-পাখি শীস দিচ্ছে। শীস-পাখিরা ট্রেন লাইনের আশেপাশে বনজঙ্গলে থাকে। তারা অবিকল রেল ইঞ্জিনের বাঁশির মতো শীস দেয়।

ভাইয়ার যে চাকরি নেই, চাকরি নেই বলেই ঝিম ধরে রেল লাইনে বসে থাকে এটা প্রথম ধরতে পারলেন বাবা। আমি স্কুল ছুটির পর ইস্টিশনে বাবা কী করছেন দেখতে গিয়েছি—বাবা বললেন, জানালা দিয়ে দেখতো রঞ্জু গাধাটা রেল লাইনের উপর বসে আছে কিনা।

আমি বললাম, হ্যাঁ।

‘কী করছে?’

‘ঘাস চিবাচ্ছে।’

‘ওর ঘটনা কি জানিস কিছু?’

‘না।’

বাবা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, গাধাটার হয় কোনো খানে প্রেম-মহব্বত হয়েছে, কিংবা চাকরি চলে গেছে। দু’টার একটা। দু ক্ষেত্রেই একটা লক্ষণ। চল খোঁজ নিয়ে আসি।

ভাইয়া দূর থেকে আমাদের দেখে ঘাস চিবানোয় আরো মন দিল। নড়াচড়াও শুরু করল। হুট করে উঠে উল্টোদিকে হাঁটা দিতে পারে। বাবা তার আগেই বললেন, রঞ্জু তোর কি চাকরি চলে গেছে?

ভাইয়া বলল, হুঁ।

‘চাকরিটা গেল কেন? চুরি করেছিস? বেদেশী এক বুড়ির লেজ ধরে কিছুদিন ঘুরলি তার ব্যাগ সাফাই করেছিস?’

ভাইয়া জবাব দিল না। আহত চোখে তাকিয়ে রইল। বাবা ভাইয়ার আহত দৃষ্টি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে বললেন- কোন ধরনের চুরি করেছিস সেটা বল, ছোট চুরি, মাঝারি চুরি না পুকুর চুরি?

‘চুরি করি নাই।’

‘এখন করিস নাই। বড় হয়ে করবি। তোর চেহারার ভেতরই একটা চোর চোর ভাব চলে এসেছে। যাই হোক পুত্র হিসাবে তোকে একটা উপদেশ দেই। চুরি করলে বড় চুরি করবি। ছোট চুরি যেমন পকেটমার করে ধরা পড়লে শক্ত

মার খাওয়া লাগে। মাঝারি চুরি করলে মার খেতে হয় না, জেল খাটতে হয়। বড় চুরি করলে সমাজে সম্মান আছে। কাজেই বড় চুরি করাটা ভালো।'

বলতে বলতে বাবা বসে পড়লেন। এটা একটা অলক্ষণ। বাবার বসে পড়ার দু'টা অর্থ এক, তিনি ক্রমাগত কথা বলা শুরু করবেন। একই কথা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলতেই থাকবেন, বলতেই থাকবেন। দুই, বাবার পেটে ব্যথাটা শুরু হয়েছে। এখন পেটে ব্যথা শুরু হলে কিছুক্ষণ বসা থেকেই তিনি শুয়ে পড়বেন। তখন তাকে ধরাধরি করে ঘরে নিয়ে যেতে হবে।

'তারপর রঞ্জু বল কি ঠিক করলি। ছোট চুরি করবি, না বড় চুরি?'

ভাইয়া বিড়-বিড় করে বলল, আমি দোকান দিব।

'দোকান দিবি? বাহ্ ভালো তো। বিজনেস ম্যান। দোকানটা কিসের?'

'চায়ের দোকান। ভাতের দোকান।'

'দোকান দিতে টাকা লাগে। টাকাটা তোকে কে দিবে?'

'টাকার যোগাড় হয়েছে।'

'তুই দেখি বিরাট লায়েক হয়ে গেছিস। সব নিজে নিজে যোগাড় করতে পারিস। যোগাড়টা করলি কীভাবে সেটা শুনি। যদি বলতে অসুবিধা না থাকে।'

'কুসুম দিয়েছে।'

'কুসুম?'

'হু। পনেরো হাজার টাকা দিয়েছে।'

বাবা চুপ করে গেলেন। কোটের পকেট থেকে সিগারেট বের করে মুখে দিতে গিয়েও দিলেন না। ঢোক গিললেন। কুসুম আপুর টাকা আছে। তার বাবা প্রায়ই তাকে টাকা পাঠান। কুসুম আপু একটা টাকাও খরচ করে না। ভাইয়া বলল, তোমার কি ব্যথাটা শুরু হচ্ছে?'

বাবা হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়লেন। ব্যথাটা শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে বাবা মূর্তির মতো শক্ত হয়ে যান। মনে হয় নিঃশ্বাসও ফেলেন না। ভাইয়া বলল, চল বাসায় নিয়ে যাই। বাবা বললেন, অসম্ভব। এখন নড়াচড়া করাই যাবে না। পানি খাব।

ভাইয়া ছুটে গেল পানি আনতে। বাবা এবং আমি দু'জনই রেল লাইন ধরে তাকিয়ে আছি। দেখতে পাচ্ছি রেল লাইনের স্লীপারে পা রেখে–রেখে জাপানি ইঞ্জিনিয়ার আসছেন। এবং দূর থেকে তার চেহারা দেখা যাচ্ছে না। তাকে চেনা

যাচ্ছে তার মাথার ছাতা দেখে। চীনাম্যান তাকে একটা হলুদ ছাতা উপহার দিয়েছেন। এই ছাতা ছাড়া তিনি কোথাও যান না।

চীনাম্যানের সঙ্গে জাপানি ইঞ্জিনিয়ারের সম্পর্ক ভয়ংকর খারাপ যাচ্ছে। প্রতিদিনই কথা কাটাকাটি হচ্ছে। জাপানি ইঞ্জিনিয়ার কুসুম আপুকে মন খারাপ করে বলেছেন। বুঝলে কুসুম, আমি যাই করি ব্যাটা বলে এটা কী করেছ? এক নম্বর স্প্যানে তিনশ বস্তা বালি ফেললাম। দুই দিন লাগল বালি ফেলতে। সব কটা বস্তা যখন ফেলা হল তখন ব্যাটা বলে কি জান? ব্যাটা বলে, বস্তাগুলি যে ভাবে ফেলছ তাতে নদীর মাঝখানে চর জাগবে। দুই নম্বর স্প্যানে পানির চাপ পড়বে।

সব বস্তা তোল। সব বস্তা যদি তুলতেই হয় তুই শুরুতে কেন বলিস না? এখন নদীর তল থেকে আমি বস্তা তুলব কীভাবে? ডুবুরী লাগাব?

কুসুম আপু বলল, কোনো কিছু করার আগে উনাকে জিজ্ঞেস করে নিলেই হয়।

'জিজ্ঞেস করলে বলে, সব কিছু আমাকে জিজ্ঞেস কর কেন? বুদ্ধি খাটিয়ে নিজে কর। তারপর চীনা ভাষায় গালি দেয়।'

'কী গালি?'

'বলে – কুঁকুঁতু, কুঁকুঁতু।'

'গালিটার মানে কী?'

'মানে জানি না। চাইনিজ ভাষা জানে এমন কাউকে পেলে জেনে নেব। মানে নিশ্চয়ই খুব খারাপ। যে দেশের সভ্যতা যত প্রাচীন সে দেশের গালাগালিও ততই খারাপ। চাইনীজ সভ্যতা অতি প্রাচীন মিং ডায়ানাস্টিই ছিল পাঁচ হাজার বছর। ওদের গালাগালি তো খারাপ হবেই।'

'চাইনীজটার গণ্ডগোলটা কি শুধু আপনার সঙ্গে?'

'আরে না। সবার সাথে। সবচে বেশি বাজাবাজি হয় জমশেদের সাথে। জমশেদের গায়ে সে একবার থুতু পর্যন্ত ফেলেছে।'

'সে কী।'

'বললাম না। অতি অসভ্য। জমশেদ প্রায়ই আমাকে বলে, দেন অর্ডার দেন। হারামির পুতরে মগরা ব্রিজ থেকে নিচে ফেলে দেই। কায়দা করে

স্প্যানের উপর ফেলব। ঠাস করে মাথা ফেটে ব্রেইন বের হয়ে যাবে। তারপরে পুলিশের কাছে বলব ব্রিজ ঠিক করতে গিয়ে পা পিছলে পড়ছে।'

'কী ভয়ংকর কথা?'

'এটা হল রাগের কথা। সত্যি-সত্যি তো কেউ ফেলছে না।'

জাপানি ইঞ্জিনিয়ার আমাদের দিকে এলেন না। তিনি বাজারের দিকে চলে গেলেন। ভাইয়া পানি নিয়ে এসেছে। সাথে রহমান চাচাকে নিয়ে এসেছে। বাবাকে যদি ধরাধরি করে বাসায় নিতে হয়। সে একা পারবে না।

পানি খেয়ে বাবার পেটের ব্যথা মনে হয় কিছু কমেছে। তিনি নিজে নিজেই উঠে দাঁড়ালেন। ইষ্টিশনের দিকে হাঁটতে শুরু করলেন। কেমন এলোমেলো ভঙ্গিতে পা ফেলছেন। মনে হচ্ছে এক্ষুনি পায়ের সঙ্গে পা লেগে তিনি আছাড় খেয়ে পড়বেন। ভাইয়া বলল, বাবার শরীরটা অতিরিক্ত খারাপ করেছে। চিকিৎসা হওয়া দরকার। বাবাকে ঢাকা নিয়ে গেলে কেমন হয়?

আমি বললাম, ভালোই হয়।

'কুসুমের টাকাটা আছে। দোকান কিছু পরে হোক। আগে বাবার চিকিৎসা হোক।'

রহমান চাচা বললেন, স্যারের পিছনে টাকা খরচ করা ঠিক না। উনাকে মৃত্যু ব্যধিতে ধরেছে। এই রোগের চিকিৎসা নাই। খামাখা টাকা নষ্ট। টাকা খুবই জটিল জিনিস। বিনা কারণে টাকা নষ্ট করা ঠিক না। হাদিসে আছে যে অকারণে টাকা নষ্ট করে সে শয়তানের ভাই।

ভাইয়া কঠিন গলায় বলল, রহমান চাচা সব কিছু নিয়ে কথা বলবেন না।

রহমান চাচা উদাস ভঙ্গিতে বললেন, সব কিছু নিয়া তো কথা বলি না। স্যারের বিষয়ে বলি। স্যারের বিষয়ে আমি যদি কথা না বলি কথাটা বলবে কে?

মা যখন আমাদের সঙ্গে ছিলেন তখন বাবা মাঝে-মধ্যে রাতে বাসায় ঘুমুতেন। এখন মা'র ঘরটা খালি। ঘুমুবার জায়গার অভাব নাই, কিন্তু বাবা রাতে থাকেন ইস্টিশনে। মা'র ঘরে তিনি ঘুমুতে পারেন না। তার নাকি গা ছমছম করে। রাতে ঘুম ভাঙ্গলে মনে হয়, বিছানার চারপাশে কে যেন হাঁটাহাঁটি করছে। খালি পায়ের হাঁটার শব্দ। যে হাটে অন্ধকারে হাড়িপাতিলের সঙ্গে মাঝে মাঝে তার পায়ের ধাক্কা লাগে। ঝনঝন করে হাড়িপাতিল চারিদিকে গড়িয়ে

পড়ে। তখন বাতি জ্বাললে দেখা যায় সব হাড়িপাতিল জায়গা মতোই আছে। একটাও নড়ে নি।

মা'র খালি ঘরে কুসুম আপু এখন আমাকে নিয়ে ঘুমায়। এতে অনেক সুবিধাও হয়েছে। জাপানি ইঞ্জিনিয়ার ভাইয়ার ঘরে একা ঘুমুতে পারেন। ভাইয়া আগে তার বন্ধুর বাড়িতে ঘুমুতে যেত। এখন ইস্টিশনে ঘুমুতে যায়। সে অবিশ্যি বাবার সঙ্গে ঘুমায় না। রহমান চাচার সঙ্গে ঘুমায়। বাবার শরীর ভালো না। কখন কী লাগে।

কুসুম আপু ঘুমুতে যাবার আগে অনেকক্ষণ আমার সঙ্গে গল্প করেন। তারপর বলেন, আর কোনো কথা না এখন ঘুমের ভান করে মটকা মেরে পরে থাকবি। কোনো শব্দ করবি না। ঘুমিয়েও পড়বি না। জেগে থাকবি। আজ আমরা ভূত ধরব। খাটের চারপাশে যে হাঁটাহাঁটি করে তাকে হাতে নাতে ধরা হবে। আমরা জেগে থাকলে সে আসবে না।

'ভূত কোনোদিন ধরা যায় না।'

'ধরা না গেলে, না যাবে। সত্যি সত্যি ভূত বলে কিছু আছে, সেই ভূতই খাটের চারপাশে ঘুরে এই প্রমাণ পেলেই আমি খুশি।'

কোনো-কোনো রাতে কুসুম আপুর মেজাজ অত্যন্ত ভালো থাকে। মনে হয় আনন্দ তিনি ধরে রাখতে পারছেন না। তখন সত্যি করে আমি বলে ফেলি, আপু ঐ চিহ্নটা আমাকে দেখাবে না?'

কুসুম আপু অস্বাভাবিক গম্ভীর হয়ে বলে, কোন চিহ্ন? লাল তিলটার কথা বলছিস?'

'হুঁ। যার জন্যে সব পুরুষ তোমার কথা শুনে।'

'মাথা থেকে এটা দূর করতে পারছিস না? বললাম তো দেখাব। আজ না। এখন ঝিম ধরে পড়ে থাক। দেখি ভূতের হাঁটাহাঁটি শোনা যায় নাকি।'

'তোমার বিয়ে কি জাপানি ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে হবে?'

'জানি না কার সঙ্গে হবে। কাউকেই আমার পছন্দ হয় না। আবার সবাইকেই পছন্দ হয়। তোকেও হয়।'

'আমি তো খুবই ছোট।'

'সারাজীবন তো ছোট থাকবি না। একদিন হঠাৎ বড় হয়ে যাবি। মানুষ কখনো আস্তে বড় হয় না-হঠাৎ বড় হয়ে যায়।'

‘কীভাবে?’

‘বলতে পারব না কীভাবে। আর একটা শব্দ করলে পাখা দিয়ে মাথায় বাড়ি দেব। চোখ বন্ধ করে শুয়ে থাক। কিন্তু ঘুমাবি না। খবর্দার ঘুমাবি না। আজ ভূত কিংবা ভূততি যাই হোক আমারা হাতে নাতে ধরব।

‘কুসুম আপু একটা কথা শুধু জিজ্ঞেস করি।’

‘কী কথা?’

‘ধলা সামছুর বৌ উনার মধ্যেও কি ঐ চিহ্নটা আছে?’

‘এই কথা কেন বললি?’

‘তার কাছে যে পুরুষ যায়, সেই বার-বার যায়। আর ফিরতে পারে না। আমাদের বদরুল স্যার গিয়েছিলেন- এখন নাকি বার-বার যান।’

‘তোদের স্কুলের বদরুল স্যার?’

‘হুঁ।’

‘তোকে কে বলেছে?’

‘সবাই বলে। স্যার এখন আর স্কুলে আসে না।’

কুসুম আপু অন্ধকারেই তালপাখা দিয়ে মাথায় প্রচন্ড একটা বাড়ি দিয়ে বলল, আর একটা কথাও না।

আমি চোখ বন্ধ করে শুয়ে থাকি। শুয়ে থাকতে থাকতেই এক সময় ঘুমিয়ে পড়ি।

এসেমব্লির পর পর আমাদের স্কুল ছুটি হয়ে গেল। মেট্রিকের রেজাল্টের পর আমাদের স্কুল সবসময়ই একদিনের ছুটি হয়। ভালো রেজাল্টের ছুটি। আজকেরটা তেমন না। আজ স্কুল ছুটি হয়েছে কারণ বদরুল আলম স্যার মারা গেছেন। রোগে শোকে মৃত্যু না – রেলে কাটা পড়ে মৃত্যু। তিনি রেল লাইনে মাথা দিয়ে শুয়েছিলেন। ধড় থেকে মাথা আলাদা হয়ে গেছে। হেড স্যার এসেমব্লিতে বক্তৃতা দিলেন।

বদরুল আলম সাহেব এই স্কুলের আদর্শ
শিক্ষক ছিলেন। দীর্ঘ তেইশ বছর তিনি
অতি নিষ্ঠার সঙ্গে শিক্ষকতা করেছেন। তার
মৃত্যুতে স্কুল একজন নিবেদিত প্রাণ শিক্ষক
হারিয়েছে। এই ক্ষতি পূর্ণ হবার না।
যাই হোক এখন অন্য একটা প্রসঙ্গ,
বদরুল আলম সাহেব সম্পর্কে কিছুদিন ধরে
সামান্য দুঃখজনক কথাবার্তা শোনা গেছে।
সবই রটনা। রটনায় সত্যতার লেশমাত্রও
নাই। এই জাতীয় দুঃখজনক রটনা যেন প্রশ্রয়
না পায় সে দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।
সম্মানিত লোকের সম্মান রক্ষা করা আমাদের
সকলের কর্তব্য। ....

বদরুল স্যারকে নিয়ে কানাঘুষা অনেক দিন থেকেই শোনা যাচ্ছিল। তিনি নাকি খারাপ জায়গায় ঘোরাঘুরি করেন। অনেকেই দেখেছে। সবদিন না, বুধবার রাতে তিনি নাকি ধলা সামছুর বৌ এর ঘরে যাবেনই। এ জাতীয় গুজবের কথা যেই শুনে সেই রেগে উঠে। ধমকের গলায় বলে- একজন মানী লোক সম্পর্কে এইসব কী কথা? ছিঃ । বদরুল স্যারকে আমরা চিনি না। ঘর সংসার আছে।

সুখী সংসার। এক মেয়ের বিবাহ হয়েছে , আরেকটা মেয়ে বিবাহের উপযুক্ত হয়েছে... তাকে নিয়ে এইসব কী কথা। এইগুলা আর কিছুই না। কিয়ামতের নিশানা। কিয়ামতের আগে আগে মানী লোক মান হারায়। দুষ্ট লোক মান পায়।

বদরুল স্যার সম্পর্কে এইসব ভালোভালো কথা যিনি বলেন তিনিই আবার গলা নিচু করে অন্যদের বলেন ঘটনা শুনেছেন? বুধবার রাতে রাতে কি ঘটনা ঘটে শুনেছেন? ছিঃ ছিঃ কী কেলেংকারী।

অনেকদিন পর রেল লাইনে মানুষ কাটা পড়ল। অপঘাতের ঘটনা সবসময় দু'বার করে ঘটে। পুকুরে ডুবে একজন কেউ মারা গেলে ধরেই নেয়া যায় খুব শিগগিরই আরেকজন মারা যাবে।

রহমান চাচা খুবই চিন্তিত। রেলে কাটা পড়ে আরেকজন মারা যাবে। সেই আরেকজন কে? ঠান্ডা মাথায় হিসাব করলেই বের করা যায়। রহমান চাচা চিন্তিত মুখে হিসেব করেন। দ্বিতীয়জন যে মারা যাবে সে বদরুল স্যারের পরিচিত হতে হবে। সে পুরুষও হবে না। একজন পুরুষের পর একজন নারী, মৃত্যুগুলি এইরকম হয়। এই সব মৃত্যু নারীপুরুষ মিলিয়ে জোড়ায়-জোড়ায় হয় এটাই নিয়ম।

রহমান চাচা আমাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে বললেন, তার হিসাবে বলে বদরুল স্যারের পরিবারের ওপর এই ঘটনা ঘটবে।

ঘটনা শেষ পর্যন্ত ঘটল।

ভোর রাতে হইচই চেঁচামেচিতে ঘুম ভেঙ্গে গেল। মগরা ব্রিজের কাছ থেকে চিৎকার আসছে। লোকজন ছুটে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে ভয়ংকর কিছু ঘটেছে। ব্রিজটা, কি ভেঙ্গে পানিতে পড়ে গেছে? জাপানি ইঞ্জিনিয়ার বলেছিলেন, ব্রিজের যে অবস্থা যে কোনো মুহূর্তে ভেঙ্গে পানিতে পড়ে যাবে। বিরাট ক্যালামিটি হবে।

কুসুম আপু বলল, টগর দৌড়ে যা, খোঁজ নিয়ে আয় কী হয়েছে। আমি যাবার আগেই রহমান চাচা উপস্থিত হলেন। তার মুখ হাসি হাসি। এই সকাল বেলাতেই মুখ ভর্তি পান। পানের রস ঠোঁট গড়িয়ে নিচে পড়ছে। রহমান চাচা আনন্দিত গলায় বললেন, বলেছিলাম না ঘটনা ঘটবে। ঘটনা ঘটেছে। আরেকজন মানুষ রেলে কাটা পড়ছে। এক্কেবারে চইদ্দ টুকরা। গোশতের দলা। চিননের কোনো উপায় নাই।

কুসুম আপু হতভম্ব গলায় বললেন, কে কাটা পড়েছে?

রহমান চাচা পানের পিক ফেলতে ফেলতে বললেন – নাক চ্যাপা চীন দেশের ‘অবিছার’ স্যার। কই দেশ, আর মরল কই। জন্মের সময়ই নির্ধারণ হয়ে থাকে, কে কই মরব। আমরার করনের কিছুই নাই।

‘কীভাবে কাটা পড়ল?’

‘সঠিক হিস্টরি কেউ জানে না। মনে হয় ব্রিজে উঠছিল পিসাব করনের জন্যে। এই ব্যাটার অভ্যাস ছিল ব্রিজের উপরে খাড়াইয়া পিসাব করনের। অতি অসভ্য। আমি এখন আবার যাইতেছি আসল খবর আনব। খবর কিছু পাব কিনা বুঝতে পারতেছি না। থানাওয়ালা চইল্যা আসছে। পুলিশ পাহারা বসছে। কাউরে যাইতে দেয় না।’

দুর্ঘটনা কীভাবে ঘটল তার নানান কথা শোনা যেতে লাগলো। রাত তিনটার সময় টর্চ হাতে চীনাম্যানকে ব্রিজের দিকে যেতে দেখা গেছে। ক্রেনের ড্রাইভার জমশেদ বলেছে, “স্যার কই যান?” চীনাম্যান তাকে একটা গালি দিয়ে বলেছে, আমি কোথায় যাই তা দিয়ে তোমার কী দরকার? তারপরই দুর্ঘটনা। এগারো সিন্দুর এক্সপ্রেস ঘটনা ঘটায়।

আরেকটা ভাষ্য হল – ঘটনা কখন ঘটে। কীভাবে ঘটে কেউ জানে না। চীনাম্যান খুব ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠেই মগ ভর্তি এক মগ কফি খান। লোকমান বাবুর্চি কফি হাতে ব্রিজের দিকে যায়। সকালবেলা ব্রিজের উপর হাঁটাহাঁটি করাও নাকি উনার অভ্যাস। বাবুর্চি ব্রিজে উঠে চিৎকার দেয়। তার চিৎকার শুনে সবাই ছুটে আসে।

আমাদের এদিকে রেলের নিচে আগেও মানুষ কাটা পড়েছে। মুহূর্তের মধ্যে হাজার-হাজার মানুষ জড় হয়েছে। কাটা পড়া মানুষের লাশ সরিয়ে নেয়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষজন চলে গিয়ে রেল লাইন আবার ফাঁকা হয়ে গেছে। আজ সে রকম হল না। মানুষ বাড়তেই থাকল। সকাল দশটায় ময়মনসিংহ থেকে রিলিফ ট্রেন চলে এল। ট্রেন লাইন থেকে উল্টে পড়লে রিলিফ ট্রেন আসে। সে-রকম কিছু হয় নি। কিন্তু রিলিফ ট্রেন চলে এসেছে। দুপুরবেলা একটা হেলিকপ্টার নামল আমাদের স্কুলের মাঠে। হেলিকপ্টারে করে দু’জন বিদেশী এবং তিনজন বাঙালি নামলেন। বাঙালি তিনজনের একজন আমাদের পরিচিত সেলুন কারে করে এসেছিলেন। লোকজন সব চলে এল হেলিকপ্টার দেখতে। মগরা ব্রিজ খালি হয়ে গেল। আমাদের এ দিকের মানুষ এত কাছ থেকে কখনো

হেলিকপ্টার দেখে নি। এত বিরাট একটা জিনিস, কিন্তু দেখাচ্ছে খেলনার মতো। খুব সুন্দর রঙচঙা খেলনা।

কুসুম আপু বলল, আয় তো আমার সঙ্গে। ঘটনা কী জেনে আসি।

আমি বললাম, তোমাকে যেতেই দেবে না। পুলিশ পাহারা। কাউকে যেতে দিচ্ছে না।

'তুই আয় আমার সঙ্গে। অবিশ্যিই আমাকে যেতে দেবে।'

'কার কাছে যাবে? জাপানি ইঞ্জিনিয়ারের কাছে?'

'হ্যাঁ। বোকা লোক তো, আমার ধারণা সে বিরাট বিপদে পড়তে যাচ্ছে।'

কুসুম আপু ঠিকই পুলিশের লোকজন পার হল। তার কোনো অসুবিধা হল না। জাপানি ইঞ্জিনিয়ারকে খুঁজে বের করতেও সমস্যা হল না। তিনি অন্ধকার তাঁবুতে একা-একা চুপচাপ বসে আছেন। হাতে পানির বোতল। চোখ লাল, চোখের কোণে ময়লা জমে আছে। চুল উস্কু খুস্কু। বাকি সবাই নদীর পারে।

নদীতে জাল ফেলা হচ্ছে। চীনাম্যানের শরীরের কাটা বড় অংশই নাকি নদীতে পড়ে গেছে। সেটা তোলার চেষ্টা। হেলিকপ্টার আসা লোকজন নদীর পাড়ে বসে আছেন। তাদের জন্যে চেয়ারের ব্যবস্থা হয়েছে। বাবাকেও দেখলাম তাদের সঙ্গে। বাবার পেট ব্যথাটা যে আবার উঠেছে তা দূর থেকেই বোঝা যাচ্ছে। তিনি উবু হয়ে বসে আছেন। একটু পর পর ঘড়ি দেখছেন। পেটে ব্যথা শুরু হলেই তিনি ঘড়ি দেখেন। ব্যথাটা কখন থাকে মনে হয় তার হিসাব রাখেন।

জাপানি ইঞ্জিনিয়ার মনে হল আমাদের চিনতে পারছেন না। অবাক হয়ে তাকিয়ে আছেন। চোখে পলক পর্যন্ত পড়ছে না। কুসুম আপু বললো, আপনার কি শরীর খারাপ?

জাপানি ইঞ্জিনিয়ার বিড়বিড় করে বললেন, টেনশনে জ্বর এসেছে। সকালে নাস্তা টাস্তা কিছুই খাই নি। তারপরেও এক গাদা বমি করেছি। উঠে দাঁড়াতে পারি না। মাথা ঘুরে। সবাই নদীর পারে গিয়েছে। আমি যেতে পারি না। এর অন্য কোনো অর্থ করে কিনা কে জানে।

কুসুম আপু বলল, অন্য কী অর্থ করবে?

'বলতে পারে সবাই এসেছে, সে কেন আসে নি? নিশ্চয়ই কোনো কিন্তু আছে।'

‘কিন্তু থাকবে কেন? আপনি নিশ্চয়ই তাকে ধাক্কা দিয়ে ট্রেনের নিচে ফেলে দেন নি?’

‘আমি কেন ধাক্কা দিয়ে ফেলব?’

‘কিংবা আপনি নিশ্চয়ই লোকজনদের শিখিয়ে দেন নি – এই চীনাম্যান আমাকে খুবই যন্ত্রণা করে তোমরা একে ধাক্কা দিয়ে চলন্ত ট্রেনের সামনে ফেলে দিও।’

‘কুসুম তুমি এইসব কী বলছ?’

‘কথার কথা বলছি।’

‘এ ধরনের কথা ভুলেও উচ্চারণ করবে না। কেউ না কেউ বিশ্বাস করে ফেলতে পারে।’

কুসুম আপু কঠিন গলায় বলল, আপনার হাত কাঁপছে কেন ঘটনা কি দয়া করে বলবেন?’

‘কোন ঘটনা না কুসুম। আমার পক্ষে কোনো অন্যায় করা সম্ভব না। সব মানুষ অন্যায় করতে পারে না।’

‘আপনার হাত কাঁপছে কেন?’

‘জানি না কেন কাঁপছে। খুবই ভয় লাগছে।’

‘পুলিশ কি আপনার জবানবন্দি নিয়েছে?’

‘হুঁ।’

‘তাদেরকে কি বলেছেন?’

‘বলেছি আমি কিছুই জানি না। ঘুম থেকে উঠে খবর পেয়েছি। যা সত্য তাই বলেছি।’

‘পুলিশ আপনার কথা বিশ্বাস করেছে।’

‘বিশ্বাস করবে না কেন?’

‘কারণ আমার বিশ্বাস হচ্ছে না। আমার মনে হয় আপনি সব কথা বলছেন না।’

‘কুসুম আমার জ্বর এসেছে। সকাল থেকে মাথা ঘুরাচ্ছে। কোনো নাশতা খাই নি। কিন্তু একগাদা বমি করেছি। এখন আবার বমি আসছে। খুবই পানির পিপাসা হচ্ছে। পানি খেতে পারি না। একটু পানি মুখে দেই, মনে হয় পানি না, চিরতার পানি মুখে দেয়েছি।’

কুসুম আপু কিছু বলল না, চুপ করে রইল। নদীর পাড় খুব হই চই শোনা যেতে লাগল। মনে হয় ডেড বডির অংশ পাওয়া গেছে। হই চই শুনে জাপানি ইঞ্জিনিয়ারের মুখ হঠাৎ ছাই বর্ণ হয়ে গেল। তিনি বিড়বিড় করে বললেন – রাত তিনটার সময় জমশেদ এসে আমাকে ঘুম থেকে ডেকে তুলল। মদ খেয়ে ভূত হয়ে এসেছে। তার মুখ দিয়ে মদের গন্ধ আসছে। ঠিকমতো দাঁড়াতেও পারছে না, টলছে। আমাকে বলল, চীনাম্যানকে সে মগরা ব্রিজের লাইনের উপর দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখেছে। একটু পরেই এগারো সিন্দুর এক্সপ্রেস আসবে। তখন ঘটনা ঘটবে। আমি তার কথা বিশ্বাস করি নি। ভেবেছি মাতালের প্রলাপ। তারপরেও টর্চ লাইট নিয়ে বের হয়েছি। ততক্ষণে এগারো সিন্দুর এসে গেছে। দূর থেকে সার্চ লাইট দেখা যাচ্ছে। আমি ব্রিজে টর্চ মেরে দেখি সত্যি-সত্যি চীনাম্যানকে পুলের উপর শুইয়ে বেঁধে রেখেছে। সে চিৎকার করে তার ভাষায় কি সব বলছে। কাঁদছে। সে যত কাঁদে জমশেদ আর তার লোকজন তত হাসে। ওদের মাথার ঠিক নাই। গলা পর্যন্ত মদ খেয়েছে। তুমি তো জান কুসুম আমার কোনো সাহস নাই যে আমি ব্রিজের উপর উঠে তাকে বাঁচানোর চেষ্টা করব। এগারো সিন্দুর এক্সপ্রেস আমার চোখের সামনে তার উপর দিয়ে চলে গেছে। শেষের দিকে চীনাম্যান কোনো চিৎকারও করে নাই। কান্নাকাটিও করে নাই। রেল ইঞ্জিনের দিকেও তাকায়ে থাকে নাই। আমার দিকে তাকায়ে ছিল।

জাপানি ইঞ্জিনিয়ার বমি করলেন। নদীর পার থেকে আবার হল্লার শব্দ শোনা গেল। কুসুম আপু বলল, তুই একটু বাইরে গিয়ে বসতো টগর। আমি না ডাকলে তাঁবুতে ঢুকবি না।

আমি বাইরে দাঁড়িয়ে আছি। দূর থেকে দেখছি—একটা কাটা হাত নিয়ে কে একজন তাঁবুর দিকে আসছে আর পেছনে অসংখ্য মানুষ। কাটা হাতটা থেকে টপ টপ করে পানি পড়ছে।

এক বর্ষা পার হয়ে আরেক বর্ষা এসেছে। সেই বর্ষা চলে গিয়ে আরো এক বর্ষা আমাদের নান্দাইল রোড স্টেশনে এসেছে। সব আগের মতোই আছে। আবার কিছুই আগের মতো নেই।

মগরা ব্রিজের কাছে আবারো তাঁবু পড়েছে। অন্য এক ইঞ্জিনিয়ার সেই তাঁবুতে থাকেন। ভদ্রলোক বয়স্ক। মুখ ভর্তি ধবধবে শাদা দাড়ি। তাঁরও অভ্যাস জাপানি ইঞ্জিনিয়ারের মতো ব্রিজের স্প্যানে সন্ধাবেলা বসে থাকা। তাঁর সঙ্গে

জায়নামাজ থাকে। সন্ধ্যা মিলালে তিনি জায়নামাজ পেতে নামাজ পড়েন। দৃশ্যটা দেখতে আমার কেন জানি ভালো লাগে। আমি সুযোগ পেলেই দৃশ্যটা দেখতে যাই।

কুসুম আপুকে তার বাবা নিজের কাছে নিয়ে গেছেন। তিনি তার বাবার সঙ্গে রাজশাহীতে থাকেন। সেখানের কলেজে পড়েন। ছুটি ছাটায় আমাদের দেখতে আসবেন বলে চিঠি লেখেন, কিন্তু আসেন না।

বাবার পেটের ব্যথাটা সেরে গেছে। কোনো রকম অষুধপত্র ছাড়াই সেরেছে। তবে অসুখ সারলেও হঠাৎ করে বুড়ো হয়ে গেছেন। মাথার চুল সব পেকে গেছে। সামনের পাটির দু'টা দাঁতও পড়ে গেছে। যখন কথা বলেন দাঁতের ফাঁক দিয়ে জিহ্বা দেখা যায়। খুবই অদ্ভুত লাগে। তিনি রাতে ইস্টিশনেই ঘুমান। আরেকটা মেল ট্রেনের স্টপেজ এখানে দিয়েছে। কারণ একজন মন্ত্রীর বাড়ি এই অঞ্চলে। মন্ত্রী চেষ্টা তদবির করে নান্দাইল রোড স্টেশনে মেল ট্রেন থামাবার ব্যবস্থা করেছেন। কাজেই এখন নান্দাইল রোড স্টেশনে রাতে তিনটা মেল ট্রেন থামে। বাবাকে স্টেশনে না ঘুমিয়ে উপায় কী।

বাসায় আমি এবং রহিমা ফুপু আমরা দু'জন শুধু ঘুমাই। রহিমা ফুপুর অঘুমা রোগ হয়েছে। সারারাত তিনি হাঁটাহাঁটি করেন। ভাইয়া চলে গেছে বিদেশে। এখন আছে নিউজিল্যান্ডে। তিনি চেষ্টা করে ভাইয়াকে বিদেশে নিয়েছেন। ভাইয়া বরফে হাত পা ছড়িয়ে শুয়ে আছেন এমন একটা ছবি পাঠিয়েছেন। বাবা সেই ছবি দেখে বলেছেন—গাধাটাকে তো চেনা যায় না। করছে কী সে? বরফ খাচ্ছে নাকি? আমি আর বাবা আমরা দু'জন মা'কে দেখতে গিয়েছিলাম। বাবা, মা'কে এই ছবিটা দিয়ে বললেন, সুরমা বলতো কে?

মা সঙ্গে সঙ্গে বললেন, রঞ্জু। পাক্কার মধ্যে শুইয়া আছে কেন? তার কী হয়েছে?

বাবা বললেন, পাক্কা না। বরফে শুয়ে আছে। রঞ্জু বিদেশে আছে। খুব ভালো আছে। তোমার জন্যে টাকা পাঠিয়েছে।

মা ভাইয়াকে চিনতে পারলেও আমাকে বা বাবাকে একেবারেই চিনতে পারলেন না। আমাকে রাগী গলায় বললেন—এই ছেলে তুমি একটু দূরে সরে বস। গায়ের উপর উঠে যাচ্ছ কেন? বাপ-মা সহবত শিক্ষা দেয় নাই?

জাপানি ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের কথা বলা হয় নি। তার কথা বলি। চীনাম্যান হত্যা মামলায় তাকেও আসামি করা হয়। জমশেদ জবানবন্দিতে বলে, সে যা করেছে সাইট ইঞ্জিনিয়ার কামরুল ইসলাম সাহেবের নির্দেশে করেছে। মামলা অনেক দিন চলে। রায় হয়। জাপানি ইঞ্জিনিয়ারের যাবজ্জীবন কারাদন্ড এবং তিনজনের ফাঁসির হুকুম হয়। জাপানি ইঞ্জিনিয়ার হাজত থেকে কুসুম আপুকে একটা চিঠি লেখেন। কুসুম আপু থাকেন রাজশাহীতে সেই চিঠিটা আমি নিজের কাছে রেখে দেই। চিঠিতে তিনি লিখেছেন—

প্রিয় কুসুম

Miss Flower,

আমাদের মামলার রায় হয়েছে। সেই খবর নিশ্চয়ই পত্রিকা মারফত জেনেছ। সবার ধারণা বিদেশী নাগরিক হত্যার কারণে রায় অত্যন্ত কঠোর হয়েছে। আমার দুর্ভাগ্য আমি যে নির্দোষ এটা প্রমাণ করতে পারি নাই। অবশ্য যাবজ্জীবন কারাদন্ড শুনতে যেমন ভয়াবহ আসলে তা না। ভালো ব্যবহারের কারণে জেলখানায় অনেক রেয়াত পাওয়া যায়। যাবজ্জীবন কারাদন্ড প্রাপ্ত আসামিদের কেউই দশ থেকে এগার বছরের বেশি জেল খাটে না। আমি অনেক চিন্তা ভাবনা করে দেখেছি দশ বছর পর তোমার বয়স হবে মাত্র ২৭, এইটা কোনো বয়সই না। দশ বছর জেলে আমার খুব কষ্টে কাটবে। এটা ঠিক। কষ্টের পরেই সুখ। যার যত কষ্ট। তার তত সুখ। সেই সুখের কথা ভেবেই আমার ভালো লাগছে।

এখন একটা আনন্দের সংবাদ দেই। মামলার রায়ের বিরুদ্ধে আমার ব্যারিস্টার (মশিহুজামান, লিংকনস পাশ করা ব্যারিস্টার। ঝানু লোক। মামলার শুরুতে তাঁকে পেলে খুবই উপকার হত। যাই হোক, আল্লাহর অসীম রহমত তাঁকে এখন পাওয়া গেছে।) হাইকোর্টে আপিল করেছেন। তিনি একশ ভাগ নিশ্চিত হাইকোর্টের রায়ে আমি খালাস পেয়ে যাব। আমার নিজেরো তাই ধারণা।

কুসুম তুমি ভালো থেকো। হতাশ হবে না। আল্লাহ্ পাক যা করেন মানুষের মঙ্গলের জন্যে করেন।

আমি সারাক্ষণই তোমার কথা ভাবি। ঐ ভয়ংকর দিন তাঁবুতে তুমি হঠাৎ কাঁদতে শুরু করলে। ছবিটা এখনো আমার চোখে ভাসে। দুঃখের মধ্যেও আনন্দ পাই।

হাইকোর্টের আপিলের রায় জাপানি ইঞ্জিনিয়ারের জন্যে খুব খারাপ হয়। তিনজনের ফাঁসির জায়গায় হাইকোর্ট জাপানি ইঞ্জিনিয়ার সহ চারজনের ফাঁসির আদেশ দেয়।

কুসুম আপুকে লেখা জাপানি ইঞ্জিনিয়ারের চিঠিটা আমি মগরা ব্রিজ থেকে নদীতে ফেলে দেই। এই চিঠিটার কথা কুসুম আপুর না জানাই ভালো।

কুসুম আপু রাজশাহী থেকে মজার মজার চিঠি লেখেন।

"এই টগর। রাতে ট্রেনের শব্দ শুনলেই কিন্তু লাফ দিয়ে বিছানায় উঠে বসবি। কারণ তোদের সবাইকে চমকে দেবার জন্যে কোনো এক রাতে আমি হুট করে উপস্থিত হব। আমি এসে যদি দেখি তুই ঘুমাচ্ছিস, তাহলে কিন্তু অসুবিধা আছে। স্যাম্পল হিসেবে একটা চুল ছিঁড়ে পাঠালাম। খবর্দার হারাবি না। আমি এলে আমাকে ফেরত দিতে হবে।"

রাতে ট্রেনের শব্দ শুনলেই আমার ঘুম ভেঙ্গে যায়। আমি অপেক্ষা করি। অপেক্ষা করতে করতেই মনে হয় সব মানুষের মধ্যে একটা ইস্টিশন থাকে। সেই ইস্টিশনের সিগন্যাল ডাউন করা। ইস্টিশনে সবুজবাতি জ্বলছে।

আনন্দময় ট্রেনের জন্যে অপেক্ষা। কারো কারো স্টেশনে ট্রেন সত্যি সত্যি এসে থাকে। কারো কারো স্টেশনে ট্রেন আসে ঠিকই, কিন্তু মেল ট্রেন বলে থামে না। ঝড়ের মতো উড়ে চলে যায়।

রাতের বেলা ট্রেনের শব্দ শুনলে আমি বিছানায় উঠে বসি ঠিকই কিন্তু স্টেশনে যাই না। ধলা সামছু যায়। হাতে হারিকেন ঝুলিয়ে ছুটে যায়। প্রতিটি কামরা লণ্ঠন উঁচিয়ে দেখে। তার স্ত্রী বাজার ছেড়ে চলে গেছে। ধলা সামছুর ধারণা, কোনো এক রাতের ট্রেনে সে আবারো এখানে ফিরে আসবে। তার স্ত্রী যেহেতু খারাপ মেয়ে মানুষ, সে দিনের ট্রেনে আসবে না। রাতের ট্রেনে আসবে। লম্বা ঘোমটা দিয়ে ট্রেন থেকে নামবে। লম্বা ঘোমটা টানা কাউকে নামতে দেখলেই ধলা সামছু তার কাছে ছুটে যায়। গলা নামিয়ে ফিসফিস করে বলে, আপনার নাম? আপনার পরিচয়?